তিন শতাব্দীর শোভাবাজার রাজবাড়ি

সুশান্ত কৃষ্ণ দেব

শরৎ বুক হাউস
১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

তিন শতাব্দীর শোভাবাজার রাজবাড়ি
প্রকাশ : মহালয়া, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক :
সুমিত্র দেব
বি এল ৩১৯ সল্ট লেক
কলিকাতা ৭০০০ ৯১

প্রচ্ছদ
সোমনাথ লাহা

কম্পিউটার বর্ণ সংস্থাপক
লাহা ইন বিজনেস্
১/১ কম্বুলিটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০০০৫

মুদ্রক
জয়ন্ত বাক্‌চি
পি.এম.বাক্‌চি অ্যান্ড কোং প্রা. লি.
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

উৎসর্গ

দেবপরিবারের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে

ভূমিকা

ছাত্রাবস্থা থেকে হিসেব করলে প্রায় পঞ্চাশ বছর কেটেছে পাথর নিয়ে নাড়াচাড়া করে, প্রথমে প্রেসিডেন্সীতে ভূ-তত্ত্বের ছাত্র এবং পরে ঐ একই কলেজের অধ্যাপক হিসেবে। অবসর নেওয়ার সময় থেকেই মন চাইছিল ইচ্ছেমত জায়গায় বেড়াতে আর পছন্দসই বাঙ্গলা/ইংরাজী বই পড়তে। কখনও একা, কখনও সস্ত্রীক সুবিধেমত বেড়িয়ে পড়তুম। বাড়ি ফিরে আবার একা, কারণ ইতিমধ্যে ছেলে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে আর স্ত্রী কাজের তাগিদে কলকাতার বাইরে।

১৯৯৯ সালের শুরুতে হঠাৎ যোগাড় করলুম সদ্য প্রকাশিত বইখানা 'ঠাকুরবাড়ির জানা অজানা'। লেখক আমার খুবই পরিচিত, বৈবাহিক সম্পর্কে বাদশা কাকা, যাঁর ভাল নামটা এই প্রথম জানা হোল-সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। যতদূর আমার জানা আছে এই বইটা তাঁর প্রথম রচনা। বইটা পড়ে খুব ভাল লাগল, ঝরঝরে হালকা ধরনের ইতিহাস। নিজের মনে বাসনা জাগল আমাদের দেববাড়ির ব্যাপারস্যাপার নিয়েও এরকম একটা লিখতে পারলে মন্দ হয় না। ঘনিষ্ঠদের মধ্যে অধ্যাপক অমিতাভ সেন শুনেই একেবারে উল্লসিত আর তাঁর কন্যা নন্দিনী সেই মুহূর্ত থেকেই তাগাদা শুরু করে দিল। সাত-পাঁচ ভেবে, চেষ্টা করতে দোষ কি এই সিদ্ধান্ত নিয়ে জুলাই, ৯৯ থেকে মাল মশলা সংগ্রহে নেমে পড়া গেল। আমার এক ভাই দেবুর মাধ্যমে আমাদের পরিবারেরই একজন, অলক তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ আমার ব্যবহারের জন্য দিতে রাজী হওয়ায়, উৎসাহ বেড়ে গেল। এর মধ্যে বিদেশ থেকে পুত্রের নৈতিক সমর্থনও এসেছে আর আমার এক লেখক বন্ধু ডঃ সমীর রায়চৌধুরীর কাছ থেকে সাহায্যের আশ্বাসও পাওয়া গেছে। আমাদের পরিবারের গৃহদেবতা শ্রীশ্রী গোপীনাথ জীউর উপর ভরসা রেখে এই প্রচেষ্টায় নামা গেছে, আশা রাখি সাধাবণ পাঠকসমাজ ও পরিবারবর্গকে কিছুটা আনন্দ দিতে পারব।

এই কাজে অলকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ আমাকে ভীষণ সাহায্য করেছে। যে কোন ব্যাপারে দেবুর সাহায্য ভোলার নয়। সমীরবাবুর মাধ্যমে কলকাতা কর্পোরেশন গ্রন্থাগারে বেশ কিছু পুরানো বইয়ের হদিস পেয়েছি আর তাঁরই সুবাদে ঐ লাইব্রেরিতে দিনের পর দিন গিয়ে বই পড়ার সুযোগ হয়েছে, গ্রন্থাগারিককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার দাদা শ্রী প্রশান্ত দেবের কাছ থেকেও দুষপ্রাপ্য কয়েকটা বই আর

একেবারে পারিবারিক বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। আমার বহুদিনের পরিচয় সূত্রে শরৎ বুক হাউসের কর্নধার শ্রী অমরচাঁদ দের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে তিনি আমার মত সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ একজন লেখককেএই কাজে সহায়তা করতে এক কথায় রাজী হয়েছেন।

দুষপ্রাপ্য বহু ছবি, বাড়ির সবরকম খুঁটিনাটি খবর, পুরানো কাগজের প্রয়োজনীয় অংশের প্রতিলিপি ইত্যাদি সব এখান ওখান থেকে যোগাড় করে আমার ভাই দেবু পৌঁছে দিয়েছে। বেশীর ভাগ তথ্য ও ছবি ধৈর্য সহকারে ও আদায় করেছে অলক কৃষ্ণের কাছ থেকে, এ দুজনেরই ঋণ ভোলার নয়। যে কোন ব্যাপারে পরিবারের অন্যান্যদের সাহায্যও পাওয়া গ্যেছ। অধ্যাপক সেনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, যিনি আমার লেখাটা অতি যত্নসহকারে পড়ে ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করেছেন। নন্দিনী বিভিন্ন ভাবে আমাকে অনেক সময় ও পরিশ্রমের হাত থেকে বাঁচিয়ে আমার নিজের মেয়ে না থাকার অভাব মিটিয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী অরুনণা চট্টোপাধ্যায আমাকে ঐ লাইব্রেরি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে উপকার করেছেন। মুদ্রনের ব্যাপারে শ্রী সোমনাথ লাহার সহযোগিতা খুবই প্রশংসনীয়। উনি নিজের পাঁচটা কাজ নিয়ে যত ব্যস্তই থাকুন না কেন, আমাকে সব সময়ে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেছেন। সবশেষে বলি, বইখানি পড়ে পাঠকরা যদি খুশী হন ও রাজবাড়ির ইতিহাস জানতে আরও আগ্রহী হয়ে ওঠেন, তাহলে আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

জন্মাষ্টমী
২৩ শে অগষ্ট,
২০০০

সুশান্ত কৃষ্ণ দেব
বি. এল. ৩১৯, সল্ট লেক
কলিকাতা ৭০০ ০৯১
৩৫৯ ০৯৮৯

প্রথম পর্ব
সূত্রপাত
এক

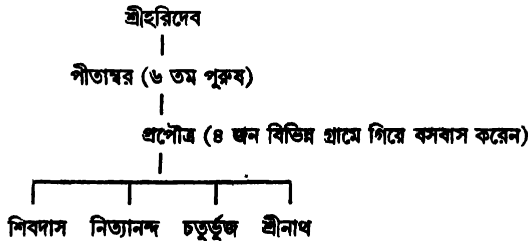
এ কথা ভাবলে বেশ অবাক হতে হয় যে একজন পিতৃহীন যুবক, বয়স তখন যার আনুমানিক ১৬, বিধবা মা ও দুই দাদার সঙ্গে কলকাতার কাছেই গোবিন্দপুর গ্রামে বসতি শুরু করার পর নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি আর চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে মহারাজা খেতাব পান এবং বিখ্যাত শোভাবাজারের দেবপরিবারের প্রতিষ্ঠা করে যান। এই নবকৃষ্ণ দেবের জন্ম মৌলিক কায়স্থকূলে, চিত্রপুরের দেববংশ এর উৎস।[১] পুরানো তথ্য থেকে জানা গেছে যে নবকৃষ্ণ দেবের উত্তরাধিকারী কেউ কেউ নিশ্চয় অনেক ভাল কাজ করেছেন, কিন্তু আসল বুনিয়াদ এবং আর্থিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি তিনিই অর্জন করেছিলেন যার রেশ ২০০ বছর পরেও চোখে পড়ার মতন। সেই সময়ের যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বন, গান-বাজনা ইত্যাদির কথা উঠলেই শোভাবাজার রাজবাড়ির নাম এসে পড়ে। যে কোন পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁকেই ধরা হয়, যিনি সমাজে একটা বিশেষ জায়গা করে নিতে পারেন। নবকৃষ্ণের পূর্বপুরুষ হিসেবে ধরা হয় * শ্রীহরিদেবকে যিনি মুর্শিদাবাদের কাছে কানসোনা গ্রামে, উর্ধতম ২৪তম পুরুষ, বসবাস করতেন[২]। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দেবীদাস, ১৮তম পুরুষ, যিনি ২৪ পরগণার মুরাগাছার কানুনগো হয়ে সেখানে বসবাস করতেন। দেবীদাসের এক ছেলে রুক্মিণীকান্ত পঞ্চগ্রাম বা পাঁচগাঁয়ে থাকতেন এবং মুর্শিদাবাদের নবাব মহবৎজং তাঁকে মুরাগাছার জমিদার কেশবরাম রায়চৌধুরীদের জমিদারির তত্ত্বাবধায়ক করেন। রুক্মিণীকান্তের পর তাঁর বড় ছেলে রামেশ্বর একই পদে বহাল হন। রামেশ্বরের দ্বিতীয় ছেলে রামচরণ মুরাগাছা পরগনার অর্থনৈতিক সচিব নিযুক্ত হয়ে ওখানকার বাসস্থান ছেড়ে কলকাতার গোবিন্দপুরে থাকার জন্য বাড়ি তৈরী করান[৩]।

মহিষাদল ও তমলুকের লবণ বিভাগে কাজে নিযুক্ত থেকে তিনি গোবিন্দপুরে থাকতে শুরু করেন। তাঁর কাজকর্মে খুশী হয়ে নবাব তাঁকে কটক এলাকার দেওয়ান করেন। দেওয়ান রামচরণকে সুবেদার মনিরুদ্দিন খাঁনের সঙ্গে পাঠানো হয় মারাঠাদের একটি অনুপ্রবেশ আটকানোর জন্য, কিন্তু কটক যাবার পথেই তাঁদের বিপদের মুখে পড়তে হয় এবং লড়াই করে হেরে যান। রামচরণ তিন পুত্র রেখে যান, নবকৃষ্ণ যাদের মধ্যে সবথেকে ছোট ছেলে। ১৭৩২ সালে নবকৃষ্ণের জন্ম বলে

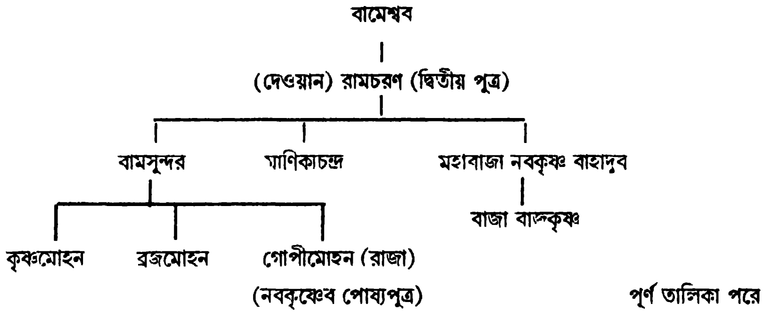
---

* অন্য এক সূত্রে জানা যায় যে এই বংশের আদিপুরুষের নাম বিজয়হরিদেব এবং মহারাজা নবকৃষ্ণ তাঁরই অধস্তন ২২তম পুরুষ। বর্তমান লেখক হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থে শোভাবাজার রাজবংশের বংশতালিকা অনুযায়ী শ্রীহরিদেব নামটি রাখার পক্ষপাতী।

জানা যায়, তবে জন্মস্থান নিয়ে মতপার্থক্য আছে। রামচরণ মারা যাবার পর তাঁর সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যায়, আর তাঁর বিধবা স্ত্রীর পক্ষে নতুন বাড়ি তৈরি করা সম্ভব হয়নি। কিছু লোকের আবার ধারণা যে তাঁদের পুরানো বাড়ি নদীতে ডুবে যায় এবং তখন নতুন বাসস্থানের খোঁজে তাঁরা সপরিবারে প্রথমে আরপুলি ও পরে শোভাবাজারে চলে আসেন। অন্য একটি মত হচ্ছে যে গোবিন্দপুর অঞ্চলে যখন ইংরেজরা নতুন ফোর্ট উইলিয়াম তৈরি করার জন্য অনেকটা জায়গা বেছে নেন, তখন নবকৃষ্ণ দেবের পরিবার ছাড়াও অন্যদেরও ঐ জায়গা ছেড়ে দিতে হয়। এই জায়গা বদলের জন্য যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, তাই দিয়েই দেবপরিবার শোভাবাজারে এসে বসবাস শুরু করেন। বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে এই দ্বিতীয় মতটি আমার কাছে বেশী যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহনযোগ্য বলে মনে হয়েছে। উৎস থেকে শোভাবাজারে দেববাড়ির পত্তন ছোট করে এটুকুই তুলে ধরা গেল। এই প্রসঙ্গে একথাও বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে পরিবারের লোকজন যখন দেওয়ানের পদে বহাল ছিলেন, সাংসারিক অবস্থা একেবারেই খুব নিম্ন মানের থাকার কথা নয়। সাময়িকভাবে ছেলেমেয়ে নিয়ে নবকৃষ্ণের বিধবা মাকে নিশ্চয় অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। এই শোভাবাজার নাম নিয়ে আবার মতপার্থক্য আছে। একটি মত হচ্ছে জনৈক শোভারাম বসাক (তখন শেঠ, বসাকরাই পয়সাওলা লোক ছিলেন) নামে এক ব্যবসায়ীর বাজার ওখানে ছিল বলেই ঐ নামের চলন ছিল। অন্যরা বলেন যে নবকৃষ্ণের মায়ের শ্রাদ্ধে যে এলাহি কান্ডকারখানা হয়েছিল তার থেকেই এলাকার/জায়গার নাম "সভাবাজার" বা শোভাবাজার হয়েছে। কোনটি ঠিক তা বর্তমান লেখকের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। এইটুকু জানা গেছে যে ১৭৫৭ সালে দেববংশের ২২তম পুরুষ নবকৃষ্ণ শোভারাম বসাকের কাছ থেকে সুতানুটি তালুকের বর্তমান শোভাবাজার জায়গাটি কিনে পরিবারের অন্য সকলের সঙ্গে সেখানে পাকাপাকি ভাবে থাকতে শুরু করেন। দেবপরিবারের বংশবৃক্ষের একটা ছোট তালিকা নীচে দেওয়া হল -



কাশীনাথ ও বিজয়বল্লভ নিত্যনন্দ থেকে অধস্তন ৫ম পুরুষ এদের বংশধর, বিজয়বল্লভের প্রপৌত্র বিদ্যাধর এবং বিদ্যাধরের ছয় পৌত্রের মধ্যে চতুর্থ দেবীদাস, যার ছয় ছেলে। কনিষ্ঠ রুক্মিণীকান্ত যার জ্যেষ্ঠপুত্র রামেশ্বর।



এই রামচরণ দেবের বড় ছেলে রামসুন্দর পঞ্চকোটের দেওয়ান হন এবং পরে দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে রায় উপাধি ও একহাজারী মনসবদারের পদ পান। ওনার মেজ ছেলে মানিক চন্দ্র নবাবের দরবারে কাজে যোগ দেন। ছেলেবেলা থেকেই নবকৃষ্ণ বেশ মেধাবী ছিলেন। মাত্র ষোল বছর বয়সেই তিনি বাঙ্গলা, ফারসী, উর্দু আর আরবী ভাষা শেখেন, আবার কাজ চালানোর জন্য ইংরাজিও দখলে আনেন। ফারসী তখন সরকারী ভাষা, সেই কারণে নবকৃষ্ণের চাকরি হোল হেস্টিংসকে ঐ ভাষা শেখানো। এই যোগাযোগটা অবশ্য হয় লক্ষীকান্ত ধর (নকু ধর) নামে একজন ব্যবসায়ীর মাধ্যমে। ইংরেজদের সঙ্গে নকু ধরের দহরম-মহরম থাকাতে এই ব্যবস্থা হয়েছিল। ১৭৫০ সালের ৮ই অক্টোবর অন্যান্যদের সঙ্গে হেস্টিংস ভারতে আসেন আর সেই সময় থেকেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে নবকৃষ্ণের যোগাযোগ যা ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। এরপর তাঁর দ্বিতীয় চাকরি হল ১৭৫৬ সালে East India Companyর মুন্সী পদ[২]। রাজবল্লভ, মীরজাফরদের পাঠানো চিঠির পাঠোদ্ধার করার জন্য ইংরেজদের একজন বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন ছিল। এই কাজটা খুব ভালভাবে নবকৃষ্ণ মুন্সীকে দিয়ে করানো হত, মাসিক বেতন হিসেবে তাঁকে দেওয়া হত ৬০ টাকা। ১৭৬০ সালে তিনি ক্লাইভের মুন্সী হলেন। ভারতে ক্লাইভের কার্যকাল ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৭, তাঁর এদেশ ছাড়ার আগেই নবকৃষ্ণ ক্লাইভের ডানহাত ও একজন নামজাদা পুরুষ হয়ে যান। সিরাজদ্দৌল্লার ভয়ে ইংরেজরা যখন ফোর্ট উইলিয়াম ছেড়ে ফলতায় জাহাজে দিন কাটাতেন, সেই সময় নবাবের ফতোয়া না মেনে তিনি গোপনে তাদের জীবনধারণের জিনিষপত্রের যোগান দিয়েছিলেন বলে ইংরেজদের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। সেই কারণে নবকৃষ্ণের পারিবারিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়। পুরস্কারস্বরূপ ১৬ই জানুয়ারী, ১৭৬৭ সালে ক্লাইভ নবকৃষ্ণকে Political Banian to the East India Company নিযুক্ত করেন আর মাসিক বেতন দাঁড়ায় ২০০ টাকা। সম্ভবত সেই জন্যই পরবর্তী সময় নবকৃষ্ণকে Dewan of Lord Clive বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যার নিদর্শন হিসেবে ঠাকুরবাড়ির পশ্চিমদিকের দরজার মাথায় একটি সাদা মার্বেল পাথরের ফলকে এই লেখাটা আজও দেওয়ালে লাগানো রয়েছে।

দুই

পুরানো দিনের ইতিহাস কিছুটা ঘাঁটলে দেখা যায় ১৮ শতকে পরাক্রমশালী মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়, বাঙ্গলার স্বাধীন নবাবদের উত্থান-পতন এবং ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা। সেই সময়ে, যখন সামন্ততন্ত্র ও ইংরাজ বণিক তথা শাসকগোষ্ঠীর মদতযোগানো নতুন এক শ্রেণীর উদয় হচ্ছে, কলকাতার শোভাবাজার রাজপরিবারের প্রাণ-পুরুষ মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের আবির্ভাব হয়[৫]। তারপর ১৯ শতক দেখেছে বাঙ্গলার 'নবজাগরণ'। ১৭৭৮ সালের ২৮শে এপ্রিল নবকৃষ্ণ দেবকে সুতানুটির তালুকদারি প্রদান করা হয়। অলককৃষ্ণ দেবের সংগ্রহ থেকে আমি এই সনদের চুক্তিপত্র পেয়েছি যাতে পরিষ্কার লেখা রয়েছে যে ইংরাজ বণিক দ্বারা গঠিত সংযুক্ত সংস্থা এবং কলকাতার মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের মধ্যে তাঁর নোয়াপাড়া এবং আরো কয়েকটি গ্রামের বিনিময়ে ওঁনাকে এই তালুকদারি দেওয়া হচ্ছে। ফোর্ট উইলিয়মে এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় এবং কোম্পানির তরফে গভর্ণর জেনারল ওয়ারেন হেস্টিংস, রিচার্ড বারওয়েল, ফিলিপ ফ্রান্সিস ও এডওয়ার্ড হুইলার বাঙ্গলার কাউন্সিলার হিসেবে সই করেন। এই দানপত্রে উল্লেখ করা আছে যে সুতানুটির কয়েকটি গ্রাম, বাগবাজার হগুল কান্ডি যা কলকাতার ভিতর অবস্থিত (কয়েকটি হাট-বাজার - সুবাবাজার, চার্লস বাজার, বাগবাজার, খালি রামবাজার এবং রাজাবাজার ছাড়া) এই তালুকদারির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আমি যে তথ্য বর্তমানে পেয়েছি তার থেকে বলা যায় তালুক সুতানুটির উত্তরসীমা বাগবাজারের খাল, পূর্বদিকে আপার সারকুলার রোড (বর্তমানে এ. পি. সি রোড) পশ্চিমে গঙ্গা আর দক্ষিণের সীমা বড়বাজার রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রিট। এই শেষোক্ত রাস্তাটি দর্মাহাটা থেকে শুরু হয়ে সারকুলার রোডের দিকে গেছে, তারপর চিৎপুর পেরিয়ে বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রিট অতিক্রম করে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট (বর্তমানে বিধান সরনি) ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে[৬]।

এই দলিলে আরও উল্লেখ করা আছে যে মহারাজ এই তালুক সঠিক ভাবে দেখা-শোনা করবেন, নিজের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী উন্নতি করার চেষ্টা নেবেন, প্রজা ও ভাড়াটের কাছ থেকে ন্যায্য ট্যাক্স আদায় করতে পারবেন এবং সমস্ত তালুকের বার্ষিক রাজস্ব হিসেবে ১২৩৭ টাকা ১৩ আনা ১০ পাই নিয়মিত কোম্পানির ধনাগারে দিতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি যে অবিশ্বাস্য হলেও এই তালুক এখনও আছে এবং সুপিরিয়ার ল্যান্ডলর্ড হিসেবে দেয় খাজনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কালেক্টারিতে নিয়মিত জমা দেওয়া হয়। গত ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৭ সালে দেওয়া ১৯৯৩-৯৪ বাবদ খাজনার রসিদ ৬ এর পাতায় দেওয়া হল।

তবে বিভিন্ন সময় কলকাতা উন্নয়ন সংস্থা (Calcutta Improvement Trust) এই

A.

H.H.

A

Dated 28th April1778

THE HONORABLE EAST INDIA COMPANY

TO

RAJAH NOBKISSAN

Attested Copy

GRANT OF THE TALLOOKDARRY OF SOOTALOOTY &c.

(2)

Twelve hundred and thirty seven, thirteen annas ten pyes shall be behind or unpaid in part or in all by the space of one full year next after any of the said days whereon the same rent or any part there of ought to be paid as hereinbefore mentioned either by monthly payments or oftener if thereunto required (the same being first lawfully demanded) then it shall and may be lawfull to and for the said United Company their successors or Assigns or the said Governor General and Council for the time being in the name of the said United Company their successors or Assigns into and upon the same premises and every part thereof in the name of the whole to reenter and the same to have again repossess and enjoy as if these presents had never been made any thing hereinbefore contained to the contrary thereof in any wise notwithstanding PROVIDED ALSO and it is hereby further agreed by and between the said parties to these present, that if the said Mahah Rajah Nobkissen his heirs Executors Administrators or Assigns do or shall at any time during the continuance of these presents extort and receive or inforce the payment from the Riotts and Tenants of the said Talookdarry or any or either of them of any larger or greater Rents dues or Duties fees or impositions whatsoever, than what have been always hitherto customarily received or at any time hereafter might be lawfully received by or on the part of the said United Company. That then in every such case the said Mahah Rajah Nobkissen his heirs Executors Administrators or Assigns shall forfeit and pay to the said United Company theirs successors or Assigns on conviction thereot the satisfaction of the said United Company or of the Governor General and Council of Fort William aforesaid for the time being by way of Fine for the Offence so omitted, Three times the amount or value of the money or other Tax or imposition so taken or to be taken as aforesaid beyond what ought or might have been lawfully had and received upon the same occasion by or on the part and behalf of the said United Company if these presents and the said recited Sunnud had not been made IN WITNESS whereof to one part of these presents remaining with the said Mahah Rajah Nobkissen, the said Warren Hastings as Governor General, Richard Barwell, Philip Francis and Edward Wheeler as Counsellors of the said presidency on the part and behalf of the said United Company have hereunto subscribed their names and fixt the Common Seal of the said United Company and to one other part hereof remaining with the said Governor General and Council the said Mahah Rajah Nobkissen hath fixt his hand and seal the day and year first above written.

Sealed and Delivered at Fort William in Bengal (where no stamps are in use or to be had) in presence of (the Interlineation of the year and words "one thousand sovon hundred and sovonty sovon" being first made in two places.)

GEO. HODGSON.

Isaac Baugh.

WARREN HASTINGS LS

RICH^D BARWELL LS

P. FRANCIS

EDW^D WHELER

Bengal Form No ...

CALCUTTA LAND REVENUE CHALLAN P

কলিকাতা রাজস্বের চালান

FOR 1993-94

বাবত ১৯ ৯৩-৯৪

Accountant's No.—
একাউন্টেন্ট নম্বর—

Division— ডিভিশন—
Block No— ব্লক নং
Holding No.— হোল্ডিং নং—
Street and No. of Premises— রাস্তা ও বাড়ির নম্বর—
Ground rent of Taluque SUTANUTTY

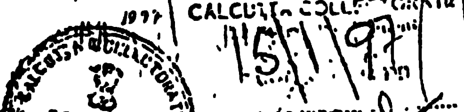
Owner.. Estate Raja Raj Kissen Deb Bahadur.
মালিক—

By.. Official Receiver, High Court, Calcutta appointed Receiver, in Old Equity Suit
যাহার মারফত—

Amount (in figures and words)— Rs. 448-29p
টাকা (অক্ষরে ও অঙ্কে) টাকা Rupees four hundred forty eight and paise twenty nine only

Period for which paid— 1993-94.
যে সময়ের জন্য টাকা দেওয়া

Dated 15.1 1997
তারিখ





Tau: ...
Treasurer.
খাজাঞ্চী।
Treasurer's No.—
খাজাঞ্চীর নম্বর—

তালুকের বেশ কিছু অংশ রাস্তাঘাট তৈরী বা নানারকম উন্নয়নমূলক কাজে অধিগ্রহণ করার ফলে বর্তমানে দেয় খাজনার পরিমান ৪৪৮ টাকা ২৯ পয়সা (৯৭ সালের রসিদ অনুযায়ী) এই অংকে দাঁড়িয়েছে। ১৭০৭ সালের জরিপ অনুযায়ী সুতানুটির আয়তন দেখানো হয় ১৬৯২ বিঘা ও ১২ কাঠা, আবার ১৭৫২-তে এই পরিমাপ দাঁড়িয়েছে ১৮৬১ বিঘা আড়াই কাঠা। মহারাজা স্বয়ং, তাঁর দত্তক পুত্র রাজা গোপীমোহন দেব এবং পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ ও তাঁর বংশধরেরা সুতানুটি অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অনেক অবদান রেখেছেন, এর প্রধান কারণ বোধ হয়

দেববংশের বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলের জমিদারির মধ্যে এই এলাকাটি ছিল খাস কলকাতায় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। যদিও অনেকের কাছেই এই নামটি অপরিচিত, খাজনার রসিদে তালুক সুতানুটি নাম পরিষ্কার।

এর পরের ঘটনা নবকৃষ্ণ রাজা থেকে মহারাজা হলেন। ক্লাইভ ক্রমশঃ সব ব্যাপারেই তাঁর ওপর ভরসা করছেন; তাঁকে করা হোল রাজাবাহাদুর সঙ্গে ৫০০০ মনসবদারী আর ৩০০০ অশ্বারোহী। এক বছর না যেতেই রাজা থেকে মহারাজা, ৬০০০ মনসবদারী আর ৪০০০ অশ্বারোহী। হাতির পিঠে চড়ে শোভাযাত্রা সহকারে নবকৃষ্ণ শোভাবাজারে এলেন। কলকাতার মানুষ নাকি সেদিনকার শোভাযাত্রা দেখে একেবারে মুগ্ধ।



রাজকৃষ্ণ দেবের বাড়ি - পশ্চিম দিকের অংশ

তিন

শোভাবাজারে মহারাজ নবকৃষ্ণেব দুটো বাসভবন ছিল, যেগুলি গঠনপ্রণালী, সাজসজ্জা ও ঐশ্বর্যর জন্য বিখ্যাত ছিল। ঐ দুটি বাড়িকেই প্রাচ্যদেশবাসীদেব বিবেচনায় প্রকৃত প্রাসাদ সৌধ বলে উল্লেখ করা হত। প্রথমে একটি বাড়ি, ঠাকুব দালান, নাট মন্দির ইত্যাদি আরো অনেক কিছু তৈরী করান এবং দত্তক পুত্র গোপীমোহন দেবকে নিয়ে থাকতেন। যে বাড়িটি লোকেদের কাছে শোভাবাজাব রাজবাড়ি নামে পরিচিত, তাকে আমাদের মধ্যে বলা হত "বাঘওয়ালা বাড়ি", সেটি বর্তমানেব ৩৫ নম্বর রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে ১৩ বিঘে ৬ কাঠা ৫ ছটাক জায়গার ওপর



পুরানো বাড়ি ও নাট মন্দির

ছড়ানো ছিল। শোনা যায় একসময় এখানেই শোভারাম বসাক নামে এক ব্যবসায়ীর বাড়ি ছিল, যেটি নবকৃষ্ণ কেনার পর আমূল সংস্কার করেন। নহবতখানা, নাচঘর, দেওয়ানখানা, লাইব্রেরি, ডিনাররুম, তোষাখানা, রাজবাড়ির মহিলাদের জন্য রঙমহল, ইত্যাদি যোগ করে একেবারে প্রাসাদপুরী করে তোলেন। প্রাসাদসংলগ্ন দেড় বিঘা জমিতে একটি বিশাল পুকুর ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে ঐ পুকুরের ধারে রাজা রাধাকান্ত দেব একটি সুন্দর থামওয়ালা নাটমন্দির তৈরী করান। তারই সঙ্গে নবরত্ন মন্দির আর একটি সুন্দর ফুলের বাগান। এখন সবকিছু পাল্টে



"বাঘওয়ালা বাড়ি"   (মেন গেট)



দেওয়ান বাড়ি

গিয়ে কি চেহারা নিয়েছে, সে আলোচনায় পরে আসা যাবে তবে আমার চোখের সামনে এখনও ঐ নাটমন্দির আর ফুলের বাগান পরিষ্কার ভাসছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই বাড়ির গঠনপ্রণালীতে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রেখে একদিকে হিন্দু স্থাপত্য যার ভেতর বৌদ্ধ ও জৈন শিল্পপ্রণালী আর অন্যদিকে ক্ল্যাসিকাল গ্রীক, রোমান, মুরিশ এবং ইসলামিক নিদর্শনের ছাপ পাওয়া যায়। নিজের ছেলে রাজকৃষ্ণ জন্মাবার পর



লাইব্রেরি



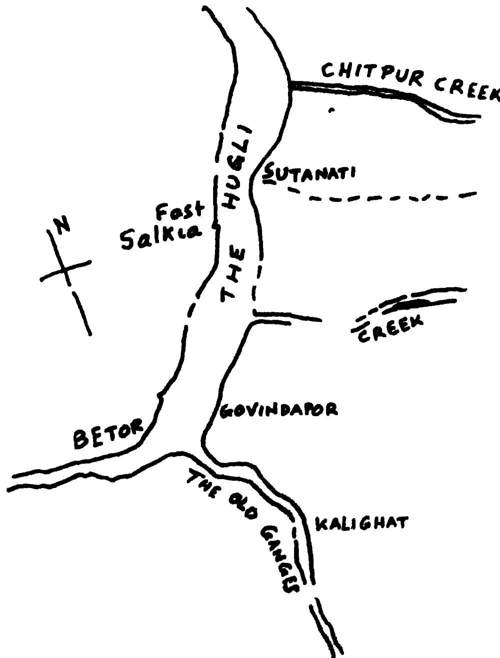
নাচঘর

পুরানো বাড়ির উল্টোদিকে ১৭৮৯ সালে উত্তর দিকে মুখ করে 'নতুন বাড়ি' তৈরী করান। এই বাড়িটিতেও পুরানো বাড়ির মতন মন্দির, ঠাকুরদালান, লাইব্রেরি প্রভৃতি সবই ছিল। প্রয়োজন অনুযায়ী এই বাড়ির সঙ্গে ক্রমশঃ আরও অংশ যোগ হয় এবং পশ্চিমদিকে বেড়ে যায় খালি পুরানো বাড়িতে ঢোকার মুখে দুদিকে যেমন সিংহ-মূর্তি বসানো (যদিও সাধারণত বাঘওয়ালা বাড়ি বলা হয়) সেরকম নতুন বাড়িতে ছিল না। রাজা রাজকৃষ্ণের আট ছেলে ছিল এবং সেই অনুসারে উত্তরমুখো বাড়িতে বড়রাজা, মেজরাজা, সেজরাজা, ছোটরাজা, এইরকম ভাবে পরিবারের লোকেরা থাকতেন। সবই দোতলা বাড়ি, যদিও পরবর্তী সময়ে কেউ কেউ আংশিক তিনতলা পর্যন্ত তৈরী করিয়ে নেন। এই সব বাড়ির একতলা বা দোতলা দিয়ে পাশাপাশি বাড়িতে চলে যাওয়া যেত, আর বিশেষ করে ছাদের পাঁচিল পেরিয়ে প্রায় পুরো পাড়াটাই যাবার উপায় থাকাতে, আমাদের ছেলেবেলায় ছাদে ঘুড়ি ওড়াবার সময়

আমরা বড়দের চোখ এড়িয়ে অবাধে যাতায়াত করেছি। এর একটা মুশকিলের দিক হচ্ছে এই সুযোগ নিয়ে চোরেরা ইদানীং এক বাড়িতে চুরি করে স্বচ্ছন্দে অন্য বাড়ির ছাদ দিয়ে পালাতে পারত, ধরা পড়ার ভয় ছিল না। যে সব বাড়ি বাড়িয়ে তিনতলায় থাকার ঘর করা হয়েছে, সেখানেই প্রায় চুরি হোত বলে ইদানীং লোহার গ্রীল দিয়ে ঘেরা হয়েছে। উত্তরমুখো ও দক্ষিণমুখো এই সারি সারি বাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে পূব-পশ্চিম বরাবর স্বনামখ্যাত রাস্তাটি নবকৃষ্ণ নিজের খরচে তৈরী করান যা প্রথম দিকে কার্যত পারিবারিক রাস্তা হিসেবেই ব্যবহৃত হোত। পুরানো রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট চিৎপুর রোড থেকে পূব-দিকে আপার সার্কুলার রোড পর্যন্ত লম্বা ছিল। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট ও হাতিবাগান স্ট্রিট এবং পরে গ্রে স্ট্রিট বর্তমানে অরবিন্দ সরনি হওয়াতে, বর্তমানে নবকৃষ্ণ স্ট্রিট অনেক ছোট হয়ে গেছে। এ ছাড়া সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ (নতুন রাস্তা) হবার পর পশ্চিমদিকে বেশ কিছু পাল্টে গেছে আর কিছু বাড়ি বাগান ভাঙ্গা পড়েছে, যে কারণে ওখানে নরেন্দ্রকৃষ্ণ পার্ক থাকার ফলে বর্তমান শোভাবাজার মেট্রো রেলের একটা স্টেশন করা হয়েছে। বাড়ির পুরানো নম্বরগুলো অনেক পাল্টেছে যদিও রাস্তার শুরুটা শোভাবাজার বাজারের সামনে চিৎপুর থেকেই ধরা হয়। দেববংশের যে সব বাড়ি ভেঙ্গে গেছে, তাদের পরিবারের লোকেরা গ্রে স্ট্রিট, শ্যামপুকুর, বেলগাছিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে নতুনভাবে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। কেউ কেউ আবার স্বেচ্ছায় নবকৃষ্ণ স্ট্রিট ছেড়ে গেছেন। এ বিষয়ে আবার পরে ফিরে আসা যাবে।

নবকৃষ্ণ বেঁচে থাকার সময় থেকেই দুই বাড়ির দুর্গাপূজোর শুরু, যা আজও চলে আসছে। তাঁর বিশাল জমিদারি গঙ্গামন্ডল (ত্রিপুরা), হুগলী, ২৪-পরগণা, মুড়াগাছা, সুতানুটি ইত্যাদি প্রায় ১৫ পরগণার দেখাশোনা তিনি নিজেই করতেন[২]। তাঁর সমসাময়িক কলকাতার সম্ভ্রান্ত লোকেদের ভেতর দর্পনারায়ণ ঠাকুর, দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন দত্ত চৌধুরী, রাজা সুখময় রায়, নিমাইচরণ মল্লিক, চৈতন্যচরণ শেঠ, বৃন্দাবন বসাক প্রভৃতি লোকেদের নাম উল্লেখযোগ্য[২]। একটি হিসেবে জানা গেছে যে মহারাজ নবকৃষ্ণের সময়ে কলকাতার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতি, কলু ও অন্যান্য সব ঘর মিলিয়ে সবশুদ্ধ ৩০০০ লোকের বসবাস ছিল[২]। নবকৃষ্ণ দেব শোভাবাজারের রাজবাড়িকে বাঙ্গালী সমাজ ও সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র করে তোলেন। তিনি কয়েকবার তাঁর থাকার জায়গা পাল্টান নিজের অবস্থার উন্নতি এবং পরিবার বাড়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। কলকাতা বলতে তখন তিনখানা গ্রাম বোঝাত সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর। সুতানুটি হাট ছিল প্রধান জায়গা, কারণ সেখানে সুতোর গাঁট আর দিশী কাপড়-চোপড়ের বাজার ছিল। শোভাবাজার অঞ্চল তখন জঙ্গল, আসলে নবকৃষ্ণই এই এলাকা তৈরী করেন। তাঁর মা মারা যাবার পর তিনি

পুরানো বাড়ি ছেড়ে ১৭৮৯ সালে নতুন ছোট বাড়িতে ছেলে রাজকৃষ্ণ আর চতুর্থ স্ত্রী সুখীদাসীকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসেন। পরিবারের অন্যান্যরা এবং বাকী স্ত্রীরা দত্তক পুত্র গোপীমোহন দেবের সঙ্গে পুরানো বাড়িতে থেকে যান। এই কারণে যদিও ১৭৫৭ সাল থেকে দুর্গাপূজো হোত একটা বাড়িতে, ১৭৮৯ সালে নতুন বাড়িতেও পুজো শুরু। অর্থাৎ বাঘওয়ালা বাড়ির পুজোর বয়স হয়ে গেল ২৪২, সেখানে নতুন বাড়িতে ২১০ বছর, এই আলোচনায় পরে ফিরে আসব। ১৭৭৭ সালে রাজা নবকৃষ্ণের মহলের সঠিক পরিসীমা ও গঠন নিয়ে কিছু প্রশ্ন তোলা হয়। ঐ বছরই ডিসেম্বর মাসে নবকৃষ্ণের আবেদনপত্রে জানানো হয় যে রামবাজার, শোভাবাজার, চার্লস বাজার (এখনকার শ্যামবাজার), রাজাবাজার এবং বাগবাজার তাঁর আয়ত্তে ছিল না। এদিকে এই সব বাজারগুলোর খাজনা সুতানুটি মহলের মধ্যেই পড়ে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে রামবাজার ও রাজাবাজারের হিসেব রাজার মাসগুজারী থেকে বাদ দেওয়া হবে। কারণ সে দুটো কাশীনাথ ও রাজবল্লভের অধীনে ছিল। বর্তমানে শ্যামবাজার ও শোভাবাজার দেবপরিবারের আয়ত্তে আছে, বাকীগুলোর ব্যাপার জানা নেই।



from:
A. K. Ray

(Not in scale)

CONJECTURAL MAP OF CALCUTTA AT THE TIME OF BRITISH ADVENT

চার

নবকৃষ্ণের অর্থ ও প্রতিপত্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর সংখ্যাও বেড়েছিল। মহারাজা নন্দকুমার এবং অল্ডারম্যান উইলিয়াম বোলষ্ট সাহেবের কুমন্ত্রনায় উৎসাহিত হয়ে কয়েকজন লোক তাঁর নামে ১৭৬৭ সালে নানারকম অভিযোগ তোলেন। ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস ফ্লয়ার সাহেবের ওপর তদন্তের ভার দেওয়া হয়। বিশেষ তদন্তের পর নবকৃষ্ণকে নির্দোষ প্রমাণিত করে অভিযুক্তকারীদেরই নানারকম শাস্তি দেওয়া হয়। এরপর যখন তিনি মায়ের শ্রাদ্ধে ৯ লক্ষ টাকা খরচ করেন, মুন্সী হিসেবে ৬০ টাকা মাইনেব চাকরী কোরে তখন অনেকেই মন্তব্য করেন যে পলাশীর যুদ্ধের পর নবকৃষ্ণ অন্যান্যদের সঙ্গে নবাব সিরাজদ্দৌলার গুপ্ত কোষাগার লুঠ করেছেন। অন্যদিকে এটাও জানা যায় যে তাঁর মাইনে ৬০ টাকা থেকে অনেক বেড়েছিল, আর মুন্সী হিসেবে এমন অনেক দান পেতেন যা সেই সময় ন্যায়সঙ্গত আয় বলেই ধরা হোত। এ ছাড়া মায়ের মৃত্যুর আগে থেকেই তাঁর মতন প্রতিভাবান ও ক্ষমতাসম্পন্ন লোকের কাছে অনেক রোজগারের পথ খোলা ছিল। কোষাগারের টাকা পয়সার ভাগ-বাটোয়ারা অনুমানটির সপক্ষে কোন যুক্তি দাঁড়ায়না[২]।

রাজা নবকৃষ্ণের বিভিন্ন কাজকর্মের বিবরণঃ

সরকারীভাবে মহারাজা নবকৃষ্ণ ক্লাইভ, হেস্টিংস প্রমুখ ইংরেজ শাসনকর্তাদের এতই প্রিয়পাত্র ছিলেন যে কোম্পানির সাতটি দপ্তরের ভার একা তাঁর ওপরই দেওয়া হয়েছিল, যার তালিকা নীচে দেওয়া হোল[৭] :

১। মুনশি দপ্তর অর্থাৎ ফারসী সেক্রেটারির দপ্তর

২। আর্জবেগী দপ্তর - সাধারণ লোকেরা কোম্পানি বাহাদুরের কাছে যে সমস্ত আর্জি বা দরখাস্ত করত তা জমা নেবার অফিস

৩। কোম্পানির বেনিয়ান ও রাজনৈতিক দেওয়ানের দপ্তর

৪। কোম্পানির ধনাগার বা খাজনাখানা

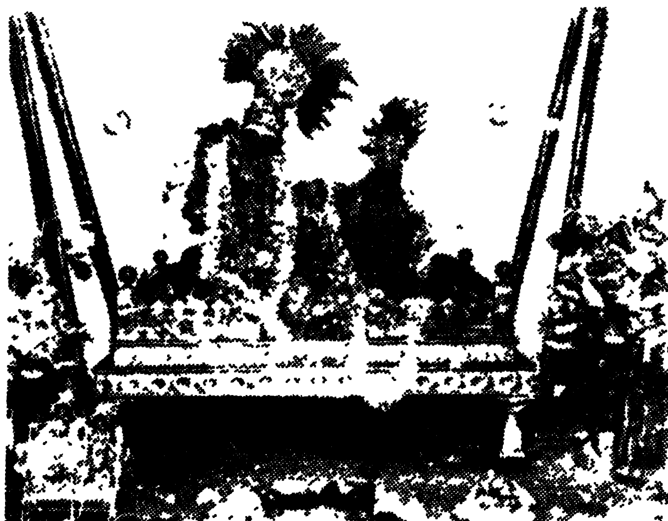
৫। ২৪ পরগণার মাল আদালত বা রাজস্ব কোর্ট

৬। ২৪ পরগণার তহশিল দপ্তর অর্থাৎ কালেক্টারের কাছারি

৭। জাতিমালা কাছারি - কোন লোকের জাত সম্পর্কে সন্দেহ বা আপত্তি উঠলে সাক্ষী-সবুদ নিয়ে তার বিচার ও মীমাংসা করার আদালত।

এই সবকটি দপ্তরের কাজ নবকৃষ্ণ তাঁর শোভাবাজার রাজবাড়িতেই চালাতেন, যদিও সাহেবপাড়ায় তাদের নিজস্ব অফিস ছিল। ৫ ও ৬ নম্বর দপ্তর রীতিমত আদালত, আর মহারাজা একাই তাদের জজ সাহেব। জাতিমালা কাছারিতে একজন

সভাপতি বা প্রধান জজ ও কয়েকজন সাহায্যকারী বিচারক থাকতেন। রাজা নবকৃষ্ণ এই আদালতের প্রথম ও প্রায় আজীবন সভাপতি ছিলেন। সেই সময় জাত-পাত নিয়ে গোলমাল প্রায় লেগেই থাকত। একদল টাকা-পয়সার দাপটে ব্রাহ্মণদের সাহায্য



গোপীনাথ-রাধারাণীর রাজবেশ

নিয়ে অন্যের বর্ণকৌলীন্য ঘুচিয়ে দিচ্ছেন আর অন্যদল ঐ উচ্চবর্ণের সাহায্যে ঐ একই কৌলীন্যে মাথা তুলছেন। জাতিমালা কাছারি ছিল এ সবের সুবিচারের কেন্দ্র যা অনেকটা মেয়র্স কোর্টের ধাঁচে রাজবাড়িতে কাজ চালাত। মেয়র্স কোর্টেও একজন সভাপতি (মেয়র) ও ৯ জন সদস্য (অল্ডারম্যান) থাকতেন। সেই কারণে কলিকাতা পুরসভা এই বাড়ির পিছনের খানিকটা রাস্তার নাম দিয়েছিল 'ওল্ড মেয়র্স কোর্ট' যা এখনও আছে।

এরপর আসা যাক পারিবারিক বা সামাজিক দিকে এদিক থেকে দেখলে তাঁর প্রথম কাজ হচ্ছে দুর্গোৎসব যা সাত্ত্বিক, তামসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক এই চার ধরণের ছিল। একেবারে খোলামনে ব্রাহ্মণ, গরীব-দুঃখীদের টাকা-পয়সা, জামা-কাপড় ও খাবার জিনিষ দেওয়া হত। পনেরো দিন ধরে নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া চলত, যে আয়োজনে আত্মীয়-স্বজন এবং হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি আরমাণি, ইংরেজ ইত্যাদি সকলেরই নেমন্তন্ন থাকত এবং অতিথিদের আপ্যায়ন করার ব্যবস্থা রাখা হত। এই উৎসবে প্রধান শাসনকর্তা ও অন্য রাজপুরুষেরাও আসতেন। আমার ছোটবেলায় দুর্গাপুজোর যে মেলা দেখার সুযোগ হয়েছে তার বিবরণ পরে লিখব।

নবকৃষ্ণের দ্বিতীয় কাজ 'পুরানো' এবং 'নতুন' এই দুই বাড়িতে ঠাকুরেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, ১৭৫৭ সালে পুরানো বাড়ির ঠাকুরদালান তৈরী হবার পর তিনি শ্রীশ্রী গোপীনাথ-রাধারাণীর মূর্তি বসান আর সেই বছরই প্রথম দুর্গাপূজোর শুরু। তারপর ১৭৮৯-তে তাঁর নতুন বাড়ি এবং ঠাকুরদালান হবার পর যখন নিজের ছেলে রাজকৃষ্ণকে নিয়ে চলে এলেন, তখন সেই সঙ্গে বাড়ির গৃহদেবতাকেও নিয়ে আসেন। পুরানো ঠাকুরদালানে সেই সময়ে শ্রীশ্রী গোবিন্দ জীউ-এর প্রতিষ্ঠা হোল। যতদিন নবকৃষ্ণ দেবের মা বেঁচে ছিলেন, ততদিন দুর্গোপূজো একটাই হোত। এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকাতে গত ১লা নভেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে পারিবারিক দুর্গাপূজো নিয়ে যে খবরটা বেরিয়েছে তার উল্লেখ করছি। একটি ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্থা আয়োজন করেছিল শতবর্ষের বেশি পুরানো পূজো নিয়ে ঐতিহ্য ১০০-র লড়াই। ১২৯টি বাড়ির পূজোর মধ্যে ঐতিহ্যে শোভাবাজার রাজবাড়ির পূজো স্বীকৃতি পেয়েছে। একই সঙ্গে জানা গেছে ৩৯০ বছরের সাবর্ণ রায়চৌধুরিদের বড়িষার পূজোটি সবথেকে প্রাচীন। এ ছাড়া পরিবেশ, নিয়মনিষ্ঠা ইত্যাদি মাপকাঠিতে অন্যান্য পূজোর ও স্থান হয়েছে।



শ্রীশ্রী: গোবিন্দ জীউ

নবকৃষ্ণের গৃহদেবতা এই গোপীনাথ রাধারাণীর বিগ্রহ নিয়ে একটি মজার ঘটনা বলা হয়েছে যা আমাদের ছেলেবেলায় বড়দের মুখ থেকেও শোনা আছে। এই বিগ্রহের (আসল) মালিক নদীয়ার কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা নবকৃষ্ণের কাছে ৩ লক্ষ টাকা ধার করেন। কিন্তু সেই টাকা সময়মত ফেরত দিতে না পারায় নবকৃষ্ণ ঠাকুরকে ক্রোক করেন।[৮] ঐ টাকার বদলে তিনি ঐ বিগ্রহটি নিজের কাছে রাখতে চান, কৃষ্ণচন্দ্র সেই প্রস্তাবে রাজী হননি এবং পরে সেই ব্যাপারে মামলা-মকদ্দমা অনেক দূর পর্যন্ত গড়ায়। উচ্চ আদালত থেকে দেববিগ্রহ ফেরত দেবার আদেশ জারী হয়। রাজা নবকৃষ্ণ তখন শ্রেষ্ঠ কারিগর দিয়ে একেবারে হুবহু একই একটি নকল মূর্তি তৈরী করে পাশাপাশি রাখা অবস্থায় কৃষ্ণচন্দ্রকে তাঁর নিজেরটি চিনে নিতে অনুরোধ করেন। আসলটির পায়ের তলায় নাকি একটি চিহ্ন দেওয়া ছিল এবং নবকৃষ্ণের ভাগ্যে সেটিই শোভাবাজারের ঠাকুরদালানে রয়ে গেছে।

নবকৃষ্ণের তৃতীয় কাজ বড় মেয়ের বিয়ের উৎসব। তাঁর নিজের ছেলে অনেকদিন পর্যন্ত হয়নি বলে, নবকৃষ্ণ বেশ কয়েকবার নিজে বিয়ে করেন এবং কয়েকটি মেয়ে জন্মায়। এই বড় মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে তিনি নানা জায়গা থেকে কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের নেমন্তন্ন করে আনিয়ে তাঁদের ফেরার সময় অনেক অনেক দান করে সম্মান দেখান। কিন্তু এ সব কাজ ছাপিয়ে রাজাবাহাদুরের চতুর্থ বা সবথেকে প্রধান কাজ হচ্ছে তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধ। এই কাজে তিনি খরচ করেন ৯ লক্ষ টাকার ওপর আবার অন্য কারও মতে ১২ লক্ষ টাকাও হতে পারে। এই খরচের বেশীর ভাগই ছিল ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর জন্য। কিছু জিনিষপত্তরের যে হিসেব পাওয়া যায় তা এই ধরনের ঃ (২০০ বছরের আগে টাকার দামের কথা খেয়াল রেখে) ২০০-৩০০ টাকা দামের বিছানা, ১০০০-২০০০ টাকার রূপো ও সোনার তৈরী জলের কলসী, ৫০০ টাকা দামের রূপো ও সোনার থালা, ১০০-২০০ টাকার ঐ একই ধাতুর কাপ এবং ঐ একই দামের আলোর প্রদীপ ইত্যাদি। এ ছাড়া ছিল নানারকম কাপড়-চোপড়, যার জন্য সকলেই খুব খুশী হয়ে এটাকে শ্রাদ্ধ না বলে একটা যজ্ঞ বলে থাকে। আসল কাজের দিন আসার আগেই এই শহর দুর্ভিক্ষের মতন কাঙ্গালীতে ভরে যায়। এই সমস্ত লোকেদের থাকা ও খাওয়ার জন্য রাজা যে সব ব্যবস্থা করেছিলেন, তা কম পড়ে যায়। দোকান-বাজারে সব জিনিষের অভাব দেখা দেয়, এমনকি কুমারটুলিতে হাঁড়ি-কলসী শেষ, গাছে কলাপাতাও ফুরিয়ে যায়। আত্মীয়-স্বজন, পন্ডিত, পুরোহিত কেউ বাদ যায়নি, এমনকি সুদূর কাশী থেকেও অনেকে আসেন। শ্রাদ্ধের দিন যে সভার আয়োজন করা হয়, তার শোভা দেখে সকলে মুগ্ধ-যার জন্যই, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জায়গার নাম সেই থেকেই শোভাবাজার বলা হয়।

রাজা নবকৃষ্ণের পরের কাজ নিজের ছেলে রাজকৃষ্ণের জন্ম উপলক্ষে উৎসব। অনেকদিন পর্যন্ত রাজার নিজের ছেলে না হওয়ায় ১৭৬৮ সালে তিনি তাঁর বড়দাদার ছেলে গোপীমোহনকে পুষ্যিপুত্র নেন, যাঁর ছেলে রাধাকান্ত দেব পরবর্তী সময়ে একজন বিখ্যাত লোক হন। দত্তক নেবার অনেকপরে অগস্ট, ১৭৮১ সালে মেমারির রামকানাই (বসু) মল্লিকের মেয়ে, তাঁর চতুর্থ স্ত্রীর গর্ভে ছেলে রাজকৃষ্ণের জন্ম। এই খুশীতে রাজা নগরের তালুক ও মফস্বলের জমিদারির প্রজাদের বাকি খাজনা মকুব করে দেন, গরিবদের অনেক টাকা-পয়সা ও খাবার জিনিষ এবং ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের উপযুক্ত দান-ধ্যান করেন। ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সমস্ত আত্মীয়স্বজনদের আপ্যায়ন করেন। আগেই জানিয়েছি ১৭৮৯ সালে নতুন বাড়িতে তিনি ছেলেকে নিয়ে চলে আসেন। আর তারপর ১৭৯১ সালে ছেলের বিয়ে এক বিরাট ব্যাপার। বরযাত্রী হিসেবে বিশিষ্ট রাজপুরুষেরা ও মাননীয় লোকজন অংশ নিয়েছিলেন। এ ছাড়া ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ থেকে ৪ হাজার ঘোড়সোয়ার সেই শোভাযাত্রায় যোগ দেয়[১]। এর কিছুদিন পরে তিনি নাতি রাধাকান্তের বিয়ে দেন। সেই সময় গোপীকান্ত সিংহ চৌধুরীর বংশে গোষ্ঠিপতিত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই পরিবারের মেয়ের সঙ্গে রাধাকান্তের বিয়ে হয়ে তিনিও গোষ্ঠিপতি বংশের মর্যাদা পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। মহারাজা নবকৃষ্ণ শোভাবাজার রাজবাড়িকে বাঙ্গালী সমাজ ও সংস্কৃতির একটি মূলকেন্দ্র কোরে তুলেছিলেন। তাঁর 'নবরত্নসভা' সেই সময় সমাজে আলোড়ন তুলেছিল। যে সমস্ত জ্ঞানী-গুনীরা তাঁর বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন তা বাঙ্গলাদেশে একেবারেই দেখা যেত না, সেই কারণে তাঁর ঐ সভার সঙ্গে বিক্রমাদিত্যের বিখ্যাত 'নবরত্নসভা'র তুলনা করা হোত। এই সভার রত্নদের মধ্যে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বালেশ্বর বিদ্যালংকার, শংকর তর্কবাগীশ, বলরাম তর্কভূষণ, বামদেব বিদ্যাবাচস্পতি এবং আরও অনেক বিদগ্ধ গুনীজনের যাতায়াত ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নামজাদা পন্ডিতদের তর্কে হারিয়ে দিয়ে তাঁরা বাঙ্গলার গৌরব বাড়াতেন। নবকৃষ্ণের ব্যক্তিগত সংগ্রহে সংস্কৃত, ফারসী ও অন্যান্য ভাষায় লেখা অনেক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বই ছিল। জমি-জমা দিয়ে ও নানাভাবে তিনি পন্ডিতদের সাহায্য করতেন। তা ছাড়া কবি গান, আখড়াই, টপ্পা প্রভৃতি বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির তিনি একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। একদিকে ব্রাহ্মণ পন্ডিত ও হিন্দু শাস্ত্রের ওপর তাঁর গভীর আকর্ষণ ছিল, আবার অন্যদিকে নিজের ক্ষমতায় কায়স্থদেরও দলবদ্ধ করতে পেরেছিলেন, এর ফলে দুই সম্প্রদায়ের লোকই-তাঁকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতেন। আগেই বলা হয়েছে যে দুটো বাড়িতেই দুর্গোৎসব চালু করা ছাড়াও তাঁর ঠাকুরদালানে গোবিন্দজী ও গোপীনাথের নিত্যসেবা এবং সারা বছর নানারকম অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও রেখেছিলেন। এখনও পর্যন্ত আমাদের ঠাকুরবাড়ি অর্থাৎ রাজা

রাজকৃষ্ণ এস্টেটের যে যে পূজো বা অনুষ্ঠানের আয়োজনের ব্যবস্থা আছে তার মূল তালিকা পরে দেওয়া হোল : *বৈশাখী ঝারা, দশহরা, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজো, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজো, সরস্বতী পূজো, শিবরাত্রি, দোলযাত্রা, নীলষষ্ঠী ইত্যাদি। এ ছাড়া আমাদের নিত্যসেবা কমিটি আরও কিছু অনুষ্ঠান যেমন জয়মঙ্গলবার, রাসযাত্রা, ইতুপূজো প্রভৃতির আয়োজন করে চলেছে। প্রথম তালিকার কাজগুলি সরকারী রিসিভারের দায়িত্বে থাকে এবং সেই বাবদে কিছু অনুদানও পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে একটা মজার তথ্য দোব, এই নিত্য সেবার নৈবেদ্য দেবার জন্য রেশনিং অফিস থেকে আমাদের পুরো ঠাকুরদেবতার পরিবারের জন্য ১৪ টি রেশন কার্ডও করা আছে যাতে কম দামে আতপ চাল, চিনি প্রভৃতি জিনিষ পাওয়া যায়। গোপীনাথ-রাধারাণী ছাড়াও, গোপাল-গোবিন্দ, নারায়ণ ইত্যাদি আরো কিছু এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। দৈনন্দিন প্রয়োজন ছাড়া, বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময় রেশন থেকে বেশী বেশী জিনিষ বরাদ্দ হয় যার থেকে ঠাকুরের ভোগ তৈরী করা হয়ে থাকে। আমার বিশ্বাস নবকৃষ্ণ দেব খুবই ক্ষমতাবান ও নিষ্ঠাবান পুরুষ ছিলেন বলেই এত বছর পরেও তাঁর প্রচলিত কাজকর্ম এখনও চলতে পারছে।

একটু আগে পূজো-পার্বণ নিয়ে আলোচনা করার সময়ে রাজা রাজকৃষ্ণ এস্টেট ও নিত্যসেবা কমিটি বিষয়ে যে উল্লেখ আছে, তার কিছুটা ব্যাখ্যা দেবো। আগেই বলা হয়েছে রাজা নবকৃষ্ণ তাঁর দাদার ছেলেকে দত্তক নেবার বেশ কিছুদিন পরে তাঁর নিজের ছেলে রাজকৃষ্ণের জন্ম হয়। কিছুদিন পরে নিজের ছেলেকে নিয়ে তিনি নতুন বাড়িতে চলে আসেন এবং সমস্ত সম্পত্তি দত্তক পুত্র আর রাজকৃষ্ণের মধ্যে মোটামুটি আধাআধি ভাগ করে দেন। অনেকের মতে রাজকৃষ্ণ বসত বাড়ি পেলেন, অন্যান্য সম্পত্তি ভাগ হয়নি। সেই নিয়ে বংশধরদের মধ্যে মামলা শুরু হয় ১৮৩৪ সালে, যার Title : Ghosh vs Ghosh-oldest Equity Suit, হাইকোর্টের এই বিখ্যাত মামলার নিষ্পত্তি আজও হয়নি আর এই মকদ্দমার কোন নম্বর নেই। ব্যাপারটা হচ্ছে মামার সম্পত্তি নিয়ে ভাগ্নেদের মামলা, যার মধ্যে এই নামগুলো পাওয়া গেছে - কিষ্ট চন্দ্র ঘোষ ঃ কৃষ্ট সখা ঘোষ এবং রাজা শিবকৃষ্ণ, রাজা কালীকৃষ্ণ, রাজা দেবীকৃষ্ণ এবং অন্যান্যরা। ৪ঠা জুলাই, ১৮৭৮ সালে ফোবার্ট হার্ভে, উ.চ. ব্যানার্জি এবং টি. এন. পালিত কলকাতা ও আশপাশের সম্পত্তির যে মূল্যায়ন করেছিলেন তাঁর মোটামুটি দাম ধরা হয় ১২৪৩০৬৮ টাকা ১১ আনা। যদিও এর মধ্যে বাগবাজারের পাকা ঘাট ও সুতানুটি তালুক ধরা হয়নি। রাজা রাজকৃষ্ণ তাঁর উইলে উত্তর ২৪-পরগণার ৮টি অংশ যেমন নাটাগড়, পানিহাটি, আগরপাড়া ও রামভদ্রবাটি

*পারিবারিক সূত্র থেকে অলক কৃষ্ণ দেবের সৌজন্যে পাওয়া গেছে

(বর্তমান সোদপুর, সুকচর ইত্যাদি) শ্রীশ্রী গোপীনাথ জীউর নামে দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন। ওদিকে স্যার রাধাকান্ত দেব তাঁর তিন ছেলেকেই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে সমস্ত অংশটাই একটা ট্রাস্টির অধীনে দেবোত্তর করে দেন। তাঁর উইলে এইভাবে উল্লেখ থাকে যে গৃহদেবতা গোবিন্দজীকে সেবা করার পর যা অবশিষ্ট থাকবে সেটাই তিন ছেলের মধ্যে ভাগ হবে। এদিকে রাজকৃষ্ণের পরিবারে মামলা চলার ফলে ১৮৩৬ সালে সমস্ত সম্পত্তির ওপর আদালত থেকে একজন সরকারী রিসিভার নিয়োগ করা হয়। তাঁর ওপরই পূজো-পার্বনের সব দেখাশোনা ও খরচ চালানোর ভার দেওয়া হয়। এরপর দেশভাগ ও জমিদারী বিলোপ আইন চালু হলে রিসিভারের আয়ের অংশ খুবই কমে যায় ও ঠাকুরের দেখাশোনা প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার সন্মুখীন হয়। সেই অবস্থা চলার সময়, দেববংশের দৌহিত্র পরিবারের জনৈক নির্মল মিত্র ১৯৫৬ সাল নাগাদ এক মামলা দায়ের কোরে পরিবারের লোকজনের সম্মতি ছাড়া রিসিভারের জমা টাকা তোলার ক্ষমতা বন্ধ করে দেন। এই সময় পর্যন্ত পরিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠ দু'একজন মিলে বাড়ি বাড়ি কিছু টাকা তুলে কোনরকমে দুর্গাপূজো এবং বড় বড় অনুষ্ঠানগুলো চালিয়ে দিতেন। ঐ মামলার রায়ে তখন একজন বেসরকারী লোক দেবোত্তর কাজকর্মের জন্য আর জমিজমা দেখাশোনার জন্য আরেকজন সরকারী রিসিভার নিয়োগ করা হয়। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের তরফ থেকে দেবোত্তরের জন্য বার্ষিক ৪০০০ টাকা মতন অনুদান বরাবরের মতন পাওয়া যায়। এই অংকটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম বলে পরিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠরা ঠিক করেন যে প্রতি বাড়ি থেকে দুর্গাপূজো এবং গোপীনাথের নিত্যসেবার জন্য বাঁধা আর্থিক সাহায্য বলবৎ থাকবে। এই ব্যবস্থা চালু থাকার কয়েক বছরের মধ্যেই আবার আর্থিক অনটন এবং নিত্যসেবার খুব দুর্দশা দেখা দেয়। সেই সময় স্বয়ং গোপীনাথের দয়ায় বলা যায়, বিভিন্ন পরিবারের কম বয়সী ছেলেরা অলক কৃষ্ণ দেবের উৎসাহে ও উদ্দীপনায় এই কাজের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে এখনও পর্যন্ত বেশ ভাল ভাবেই সব কিছু করে আসছে। শুধু তাই নয়, ওদের মুখ থেকেই শোনা যে তহবিল একেবারে প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে তা আমার ঐ ভায়েদের চেষ্টায় আবার নাকি খুবই চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ওরা বুঝতে পেরেছে যে ওদের পরবর্তী প্রজন্মে তরুনদের সংখ্যা ৪০-এর বেশী থেকে কমে ৮-৬ এ দাঁড়াবে, কারণ পরিবারের মেয়েদের সংখ্যা বেড়েছে। সেই আশংকায় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ওরা আদায়করা টাকাটা একটা ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে রেখেছে, এর থেকে ভাল কাজ আর কি হতে পারে? এই ছেলেরা আসরে নামার পর প্রথম দিকটায় কিছু সমালোচনার মুখোমুখি হয়, কিন্তু কাজ দেখিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করতে পেরেছে বলে আমি মনে করি। রিসিভারের অধীনে এই এস্টেটের

দেখাশোনার ভার একটি নিত্যসেবা কমিটির ওপর রাখা আছে, যার মাথায় একজন পরিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠ লোক আছেন। বর্তমানে আমার সম্পর্কে এক কাকা শ্রীশিশিরেন্দ্র কৃষ্ণ দেব এই কমিটির সভাপতি, (তিনি সম্প্রতি মারা গেছেন, তাঁর জায়গায় এখন শ্রী সলিলেন্দ্র কৃষ্ণ দেব রয়েছেন,) যাঁর নাম দিয়ে দুর্গাপূজোর নিমন্ত্রন পত্র ছাপা হয়। আমাদের বাড়ির অনেক রোজগার করা শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা আজকাল নিজে থেকেই কিছু কিছু টাকা ঠাকুরবাড়ির জন্য দেয় যেটা তাদের পারিবারিক অংশের বাইরে। রাজকৃষ্ণ দেবের সেজরাজার বাড়ির একজন বংশধর হিসেবে (৭ম পুরুষ) আমি এই ব্যবস্থার কথা ভেতর থেকে বলতে পারছি 'পুরানো বাড়ি' বা রাজা রাধাকান্ত দেবের পরিবারের বর্তমান ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার জানা নেই বলে ঐ বাড়ির ব্যাপার নিয়ে আর আলোচনা করলুম না। আমাদের বাড়ির কমিটির লোকেদের আরও একটি বড় কাজ হোল মেট্রো রেল এবং গঙ্গা এ্যাকশন প্ল্যানের কাজকর্মের জন্য এ পক্ষের দেবোত্তর সম্পত্তির এক্তিয়ারে যে সমস্ত টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে জমা পড়েছে তার মূল অংশ উদ্ধার করা এবং ঠাকুরের দেখাশোনার সুবন্দোবস্ত করা। অন্যদিকে সরকার ও কলিকাতা কর্পোরেশনের নতুন নীতি অনুযায়ী আমাদের এই সব পুরানো বাড়িগুলো এখনও যা অবশিষ্ট আছে তা কলকাতার Heritage Buildings তালিকাভুক্ত হওয়ার ফলে, আশা করা যায় যে এগুলির আর ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা কম। ঐতিহাসিক নিশীথ রঞ্জন রায় ও আরো কয়েকজন বিদগ্ধ মানুষের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। নাটমন্দির ও নবকৃষ্ণ দেবের 'পুরানো বাড়ি' যার এখনকার ঠিকানা ৩৫ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রিট, ইতিমধ্যেই উপযুক্ত সংস্থার হাতে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য তুলে দেওয়া হয়েছে। এব ফলে কলকাতার ঐতিহাসিক ও বিখ্যাত মনীষীদের বাড়িগুলো হয়ত আধুনিক যুগের কবল থেকে রক্ষা পাবে বলে আমার মনে হয়। এর সঙ্গে বাঙ্গালীদের দুর্গোৎসবের মতন অনুষ্ঠানসূচি যদি বজায় রাখা যায়, তাহলে বিদেশীরা ছাড়াও নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হবে। ইদানীং পশ্চিম বঙ্গ পর্যটন বিভাগ দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন পুরানো পরিবারের পূজামন্ডপ দেখানোর ব্যবস্থা হওয়াতে স্থানীয় এবং বিদেশী পর্যটকদের কাছে পূজো খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া আধুনিক প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে দূর বিদেশেও সরাসরি দেখানোর ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

পাঁচ

মহারাজা নবকৃষ্ণের জনহিতকর কাজকর্ম এবং তাঁর দানশীলতা -

রাজা নবকৃষ্ণের কাজকর্মের খতিয়ান দিতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় বেহালা থেকে কুলপি পর্যন্ত ৩২ মাইল রাস্তা তৈরী করার কথা। 'রাজার জাঙ্গাল' নামে পরিচিত এই রাজমার্গ তাঁরই বদান্যতার ফল। 'পুরানো' ও 'নতুন' বাড়ির মাঝখান দিয়ে যে রাস্তাটি তাঁর নিজের নামে রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রিট পূব দিক থেকে পশ্চিম দিকে গেছে তা তিনি নিজের খরচেই তৈরী করান। তাঁর সময়ে এই রাস্তা চিৎপুর থেকে আপার সার্কুলার রোড পর্যন্ত ছিল, আর এখন কাটছাঁট হয়ে যা দাঁড়িয়েছে তা আগেই বলেছি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আশপাশের পুরানো লোকেরা এটাকে রাজা-রাস্তা বলে চিহ্নিত করেছে। বাগবাজার ও কুমারটুলির লোকেদের গঙ্গায় চানের সুবিধে করার জন্য বাঁধানো ঘাট তৈরী করান। রাজা নবকৃষ্ণের ঘাট[৭] ছাড়াও রাজকৃষ্ণের ঘাট, কালীকৃষ্ণের ঘাট ও রাধাকান্তের ঘাট [৮] এই নামগুলিও পাওয়া যায়। এ ছাড়া আমাদের পরিবারের লোক মারা গেলে গঙ্গার ধারে একটি নিজস্ব দাহ করার জায়গা এখনও পর্যন্ত রয়েছে বলে জেনেছি, তবে চানের ঘাটের বাঁধানো সিঁড়ি ও বাড়ির অংশ বেশ কিছুদিন হোলো ভেঙ্গে পড়েছে। গঙ্গাযাত্রীরা মারা যাবার আগে যাতে নির্বিঘ্নে দু'চারদিন কাটাতে পারেন তার জন্য রাস্তার ওপর একটা ছোট বাড়ি করিয়েছিলেন। ১৯৬১ সালে আমার ঠাকুমার শেষ ইচ্ছানুযায়ী বাবা-কাকারা তাঁর অন্তর্জলি যাত্রা করান এবং যতদূর জানা যায় কলকাতায় এটাই শেষ গঙ্গাযাত্রা। ঐ বাড়িটি এখন বেদখলে চলে গেছে। এই প্রসঙ্গে জানাই যে আমার ঠাকুরদা কুমার হেমেন্দ্র কৃষ্ণ দেব একজন শিক্ষিত সঙ্গীতপ্রেমী এবং ঈশ্বরভক্ত মানুষ ছিলেন। তিনি রোজ গঙ্গাচান করতেন, গঙ্গার পথে খালি পায়ে চলার সময় পায়ে হাড় ফুটে মাত্র ৩২ বছর বয়সে ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মারা যান, যখন আমার বাবার বয়স মাত্র পাঁচ।

নবকৃষ্ণের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত গঙ্গামন্ডলে (ত্রিপুরা অঞ্চলে ৯৭,০০০ একর জায়গা) ১২ মাইল লম্বা একটি খাল কাটিয়েছিলেন। ১৭৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে পুরানো কবরখানা এলাকা ছাড়া তিনি ৬ বিঘে জমি দান করেন যেখানে সেন্ট জনস্ গির্জা তৈরী হয় এবং এরই উঠোনে কলকাতার স্থপতি জব চার্ণকের সমাধিও আছে। *

জানা গেছে যে ঐ সময় জমিটির দাম ছিল ৩০,০০০ টাকা। ঐ গঙ্গামন্ডলের জমি হাতছাড়া হবার পর ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৪০,০০০ টাকা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে

*চার্চ কর্তৃপক্ষের চিঠি পরের পাতায়

আরও কিছু চাঁদা তুলে ১৯৩৬ সালে আমাদের ঠাকুরদালানে পুরো মার্বেল পাথর বসানো হয়েছিল। হেস্টিংসের একটি বিবরণ থেকে জানা যায় যে ফারসী ও আরবী শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা তৈরীর জন্য নবকৃষ্ণ ৩ লক্ষ টাকা দান করেন। লিখিত তথ্য

CALCUTTA DIOCESAN TRUST ASSOCIATION (PRIVATE) Recd. 13/9/90

(Registered under the Indian Companies Act. 1913)

Telephone : 44-5259
Telegram : "CALCESE" CALCUTTA

Registered Office :
BISHOP'S HOUSE
51, CHOWRINGEE ROAD
CALCUTTA-700 071

Ref: CDTA(P)/CH-2/636.

4.9.1990.

Shri Rathindra Narayan Deb And Others,
33/1/14, Raja Naba Kissen Street,
Calcutta - 700 005.

Dear Sirs,

Reg: Your letter dated 17.8.90. in connection with St. John's Church at Council House St., and Tricentinary Celebration of Calcutta.

Your letter dated 17th August, 1990, with regard to the marble tablet commemorating the 'Gift Deed of Land' by the Maharaja Naba Kissen Deb and a note from Warren Hastings. I have since got in touch with Rev. J.G. Stevens, the Presbyter-in-Charge of St. John's Church, and discussed the matter with him.

Rev. Stevens will very much appreciate if some of your family Members kindly visit him one of these days, he will explain and show you around the Church.

You have stated in your letter that the marble tablet was removed from its original site. But it has now been very prominently displaced where everybody could see and read it and know the fact that the land was made as "Gift" by the Maharaja Naba Kissen Deb in 1783.

Yours faithfully,

(S. M. BOSE)
HONY. SECRETARY

cc: Rev. J.G. Stevens
Presbyter-in-Charge
St. John's Church
2/1, Council House Street
Calcutta - 700 001.

থেকে আরও জানা গেছে যে, কালীঘাটের মন্দির-দর্শনে গিয়ে তিনি ১ লক্ষ টাকা খরচ করেন যার হিসেব এইরকম পাওয়া গেছে ঃ- ১০,০০০ টাকা দামের গলার মালা, রূপোর বাসন, দামী বিছানা, হাজার জন লোককে খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় মিষ্টান্ন এবং ২ হাজার গরীবদের আর্থিক সাহায্য। কলকাতার উত্তরে খড়দহের কাছে

বল্লভপুরের রাধাবল্লভ মন্দিরের জন্য জমি, বাড়ি এবং ১৬ টি ব্রাহ্মণ পরিবারের জন্য বছরে ৩০০০ টাকার অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়। সুদূর বারাণসীতে বিশ্বনাথের মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রী নবকৃষ্ণেশ্বর নামে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও একই সঙ্গে রোজ ওখানে পূজোর ব্যবস্থা করা হয়। আগেই জানিয়েছি যে নবকৃষ্ণ তাঁর নতুন বাড়িতে শ্রীশ্রী গোপীনাথজীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, ঠাকুরের অনেক গহনা ও রূপোর বাসনকোশন দান এবং নিত্যসেবার জন্য টাকার ব্যবস্থা করেন। তিনি যে কায়স্থদের কুলাধিপতি হয়েছিলেন তা শুধু তাঁর বিষয়সম্পত্তির জোরে নয়। নানারকম ধর্মীয় আচারব্যবহার ও জনহিতকর সামাজিক কাজকর্মের জন্য তাঁকে গোষ্ঠীপতি বলে মানা হোত। তাঁর বাড়ির উৎসব-অনুষ্ঠানে একদিকে যেমন সম্ভ্রান্ত ইংরেজদের সমাগম হত, অন্যদিকে অনেক দেশী লোকেরাও আমন্ত্রিত হতেন বলে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা যোগাযোগের সুযোগ ছিল।

২২শে নভেম্বর, ১৭৯৭ সালে নবকৃষ্ণ মারা যাওয়ার পর দত্তক পুত্র গোপীমোহন দেব ও রাজা রাজকৃষ্ণের মধ্যে মামলা হয়। প্রিভিকাউনসিল পর্যন্ত মামলা গড়িয়ে উভয়পক্ষ সমস্ত রাজকীয় সম্পত্তির সমান সমান অংশের মালিক হন (যদিও এ নিয়ে পরিবারের মধ্যে মতভেদ রয়েছে)। যতদূর জানা আছে কলকাতার বেশীর ভাগ অংশ পেলেন বড় ছেলে গোপীমোহন আর আশপাশের অংশের মালিক হলেন নিজের ছেলে রাজকৃষ্ণ। কালক্রমে রাজা রাজকৃষ্ণের আটজন ছেলে হয়-এঁরা হলেন মহারাজা শিবকৃষ্ণ, রাজা কালীকৃষ্ণ, রাজা দেবীকৃষ্ণ, রাজা অপূর্বকৃষ্ণ, রাজা মাধবকৃষ্ণ, মহারাজা কমলকৃষ্ণ, মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ এবং অষ্টম পুত্র রাজা যাদবকৃষ্ণ। এই বইয়ের শেষে ১৯৮১ সালে তৈরী দেববংশের একটি বংশ-তালিকা দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে অবশ্য মেয়েদের দিকটা সংযোজিত করা হয়নি। বলা বাহুল্য এই তালিকা ২০ বছরের পুরানো, বোধ হয় এখন এটি সম্পূর্ণ সংশোধিত করা গেছে। রাজা রাজকৃষ্ণের বংশধরদের মধ্যে অনেকেই কিছু না কিছু বিষয়ে নিজের পরিচয় রাখার মতন কাজ করেছেন। তাদের সম্বন্ধে পরে কিছু সংক্ষিপ্ত তথ্য পরিবেশিত হবে।

উপস্থিত সেজ রাজা দেবীকৃষ্ণের উত্তরপুরুষ হিসেবে আমি এই পরিবারের সম্বন্ধে কিছু ব্যক্তিগত বিবরণ ও অভিজ্ঞতার কথা জানাতে আগ্রহী। রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট রাস্তাটি সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ যখন ১৯৩৬ সালে তৈরী হয় তার অনেক আগে থেকেই ছিল। প্রথমটিকে যেমন বলা হত রাজা রাস্তা, এটিকে লোকে বলত নতুন রাস্তা। রাজকৃষ্ণের বংশধরেরা যে অট্টালিকাগুলিতে থাকতেন নতুন রাস্তা করার সময় তার বেশ কিছু রদবদল প্রয়োজন হয় এবং কয়েকটা বাড়ি ভাঙ্গাও পড়ে। যার ফলে পুরানো বাড়ির নম্বর পাল্টে যায়। শোভাবাজার মেট্রো স্টেশন যে পার্কে এখন তৈরী হয়েছে, সেখানে আগে মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব পার্ক ছিল। দেব পরিবারের দু'একজনকে তাঁদের নিজেদের অংশ ছেড়ে কাছাকাছি কোথাও নতুন করে থাকার

জায়গা করতে হয়েছিল। ছোট রাজার পরিবারের এক অংশ চলে যান শ্যামপুকুর অঞ্চলে ও আরেক অংশ বেলগাছিয়াতে কারণ এদের বাড়িটা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট আর নতুন রাস্তার মোড়ের দিকে ছিল বলে বেশীটাই ছেড়ে দিতে হয়। এই সব পরিবারের বংশধরেরা ঐ নতুন আস্তানাতে এখনও বসবাস করছেন। এ ছাড়া কেউ কেউ আবার তাঁদের নিজের নিজের অংশ পরিবারের মধ্যেই বা অন্য কাউকে বিক্রী করে দিয়ে অন্য সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন। আবার এমনও আছে যাঁরা নিজের ঘরদোর রাখতে না পারায় ঠাকুরবাড়ির ফাঁকা কিছু জায়গায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। আর পরবর্তী সময় দৌহিত্র বা কোন শরিকের জামাই যে সম্পত্তির মালিক হয়েছেন তাও হয়ত কিছু কিছু হাত পাল্টেছে। এ ছাড়া উত্তর দিকের গোপীমোহন দেবের এক্তিয়ারের কোন কোন অংশ হাত বদলেছে এবং বর্তমানে জবরদখল হওয়াতে নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের এখনকার চেহারার রূপ নিয়েছে। বলা বাহুল্য আমাদের ছেলেবেলাতেও যে সব ফাঁকা জায়গা, লম্বা টানা ছাদ, বড় বড় তোরণের মত গেট



রাজকৃষ্ণ দেবের বাড়ির পূর্বদিকের অংশ

ইত্যাদি ছিল তা এখন একেবারেই শেষ, কেবল দেবোত্তর অংশটুকুতে হাত পড়েনি। কিন্তু একটা বিষয় চিন্তা করলে অবাক হতে হয় যে এত ঘাতপ্রতিঘাত সত্ত্বেও আজও এই রাস্তার দু'ধারে যে সারি সারি বাড়িগুলি বর্তমান তার অধিকাংশের বাসিন্দাই হচ্ছে দেবপরিবারের লোক। আমার মনে হয় না এ শহরে আর কোথাও পাশাপাশি এক পরিবারের লোকেরা এই ভাবে আছে এবং পূজাপার্বণে তাদের বিশাল ঠাকুরবাড়িতে জমায়েত হচ্ছে, রাজা নবকৃষ্ণ দেবের এটাই এক বিরাট কৃতিত্ব ও সাফল্যের পরিচয়। এইরকম গায়ে গায়ে লাগানো এবং এখন মাঝে মাঝে দুই বাড়ির মধ্যে দেওয়াল দিয়ে ভাগ করে যে দেবেদের বাড়িগুলো আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য

ব্যতিক্রম হচ্ছে 'মিত্তির বাড়ি' (এখন সামনের দিকটা Modi House) আর তার পাশেই জয়পুরিয়া কলেজ, যথাক্রমে ১৪ এবং ১২ নম্বর রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট। ভেতরের খবর এই যে রাজা রাজকৃষ্ণের অষ্টম সন্তান রাজা যাদবকৃষ্ণের কোন ছেলে ছিল না বলে মেয়ে কৃষ্ণরমনীর মিত্রবংশীয় স্বামী ঐ অংশটি পান, সেই থেকে তাদের বংশ বেড়ে এই বাড়িটির নাম 'মিত্তির বাড়ি' হয়। এই বাড়ির নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের দিকের খানিকটা অংশ বিক্রী হয়ে বর্তমানে 'মোদি হাউস' নাম হয়েছে, বাড়ির পিছনের দরজা গ্রে স্ট্রিট হওয়ায় ঐ বাড়ির লোকেরা এখন ঐ দিক দিয়ে ঠাকুরবাড়ি আসাযাওযা করে। আর মহারাজা শিবকৃষ্ণের ছেলে ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের এক নাতনীর



ছবিতে নাটমন্দিরের চূড়ো ও পুকুর

বিয়ে হয় এক বোসবাড়ির ছেলের সঙ্গে। সেই বাড়ির ছেলেরা মামার (দাদুর) বাড়িতে থাকতে থাকতে ঐ বাড়ির মালিকানা পায়। কিন্তু তাদের ব্যয়ের ভার বাড়তে বাড়তে এমনই আর্থিক অবস্থা আসে যে ১৯৪৫ সালে তারা বাড়িটি বিক্রী করে দেয়। সেখানে এখন বিশাল জয়পুরিয়া কলেজটি তৈরী হতে পেরেছে যা স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এসে উদ্বোধন করেছিলেন। আমাদের ছোটবেলায় এই বাড়িটিকে আমরা বউরাণীর বাড়ি বলে জানতুম। আমাদের পাড়ার দুর্গাপুজোর সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় আবার এই বাড়ির কথায় আসব। এ ছাড়া ৩৬ নম্বর নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে আমাদের ঠাকুরবাড়ি আর তার পাশে কালীকৃষ্ণ লেনের সংযোগস্থলে বাড়িটি আমরা খোকাবাবুর বাড়ি বলেই জানতুম, যার এক অংশ আজকাল বিয়েবাড়ি হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয়, সেটা আসলে রাজাদের আত্মীয় এক বসু মল্লিকের বাড়ি। রাজা কালীকৃষ্ণের এক নাতি সুশীলকৃষ্ণের মেয়ে কৃষ্ণ শৈলবালার বিয়ে হয় এই মল্লিক পরিবারে এবং জামাই বংশপরম্পরায় এই পাড়ার বাসিন্দা হয়ে গেছেন, এ বাড়ির আসল দরজা কালীকৃষ্ণ লেনের দিকে বন্ধই থাকে। ঐ বাড়ির দাদারা যে আমাদের

দেবপরিবারের লোক নয়, তা আমি অনেক বড় হয়ে জেনেছি। এইটা হোল রাজা রাজকৃষ্ণের বংশধরদের বাড়ির ছবি। উল্টোদিকে, অর্থাৎ গোপীমোহন দেবের অংশে পরিবর্তন অনেক বেশী চোখে পড়ার মতন।

বাঘওয়ালা বাড়ির গেট থেকে একেবারে সেন্ট্রাল এ্যাভেনিউর মোড় পর্যন্ত যে টানা ছাদ ছিল, আস্তে আস্তে তা ভেঙ্গে ক্রমশঃ ছোট হতে থাকে আর তার জায়গায় বেশ কয়েকটা নতুন বাড়ি উঠেছে। ঐ বংশের এক শরিকের বাড়িও তার মধ্যে আছে। এই বাঘওয়ালা বাড়ি সংলগ্ন যে নাটমন্দির, বাগান, পুকুর, কাছারী বাড়ি, গেষ্ট-হাউস ইত্যাদি ছিল সেগুলোও অনেক পাল্টেছে। কাছারী বাড়ির জায়গায় বর্তমান টেলিফোন ভবন, এবং নতুন রাস্তার দিকে আমরা যে Boy Scout Ground দেখেছি সেখানে এখন বড় বড় বাড়ি হয়ে ঐ জায়গার পুরানো চেহারা একদম বদলে গেছে। ঐ মাঠে আমাদের ছেলেবেলায় বেশ ভাল ভাল দলের ফুটবল খেলা হত, আমি আবছা আবছা মনে করতে পারি। বলা বাহুল্য যে এই রাজা রাস্তায় আগে গ্যাসের আলো জ্বলত এবং এও মনে পড়ে কর্পোরেশনের বেতনভুক্ত একটি লোক হাতে একটি আঁকশি লাগানো লম্বা লাঠি নিয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যে হবার মুখে সেই সুন্দর আলো গুলো জ্বালিয়ে দিত। এই রাস্তার ১৮ নম্বর বাড়িতে, রাজা রাজকৃষ্ণের উত্তরপুরুষ হিসেবে সেজরাজা দেবীকৃষ্ণের বাড়ির এক অংশে আমার জন্ম এবং কয়েক বছর আগে পর্যন্ত বসবাস করতুম। কমবেশী পঞ্চান্ন বছর আমি ঐ পরিবেশে ক্রমবর্ধমান পরিবারের একজন হয়ে থেকেছি, মাত্র ৪-৫ বছর পড়াশোনা আর গবেষণার কাজে ইউরোপের প্রাগ শহরে কাটাতে হয়েছে।

কথায় বলে অমুকের সাত পুরুষ বসে খাবে। আমি এই বংশের সপ্তম পুরুষ (রাজা নবকৃষ্ণ দেবকে প্রথম পুরুষ ধরে) হিসেবে সৌভাগ্যবশতঃ বসে না খেয়েও, বংশের প্রতিষ্ঠাতা যে বিপুল বিষয়সম্পত্তির মালিক ছিলেন তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। এই কথার তাৎপর্য আরও পরিষ্কার হয় যখন কলকাতার অন্য কয়েকটি বনেদী পরিবারের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করি। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে এই বিশাল পরিবারের কাউকে সেরকম ব্যবসায়িক উদ্যোগ নেবার কথা জানা নেই।

আমাদের এই ভাগ ভাগ হওয়া প্রত্যেকটা বাড়িতে পূর্বপুরুষদের কিছু তৈলচিত্র ও অন্যান্য দেশী এবং বিদেশী চিত্রকরের আঁকা ছবি আছে। ছোটবেলা থেকেই এগুলো আমার কাছে বেশ আকর্ষনীয় ছিল। যে লম্বা বৈঠকখানা ঘরে এগুলি দেওয়ালে ঝোলানো থাকত, দোতলায় সেই ঘরটাতেই আমাদের ভাইবোনেদের খেলাধুলা ও সময় কাটানোর জায়গা ছিল। বিশেষ করে স্কুলের গরমের ছুটির সময়, বাবাকাকারা যখন কাজেকর্মে বেরিয়ে যেতেন, তখন এই বাইরে বাড়ির ঘরটা সম্পূর্ণ আমাদের দখলেই সারাদিন থাকত। যে ছবিটা আমাকে খুব অবাক করত, সেটা মহারাজা নবকৃষ্ণের বাগানের

মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় চাকরের সঙ্গে পুরো চেহারার ছবিটা। পরিষ্কার ছোট মাপের ধুতি পরা, কাঁধে পাট করা চাদর, একেবারে খালি গা, মাথাটা পরিষ্কার করে কামানো আর মাথার পিছনে এক গোছা টিকি; নবকৃষ্ণের ঠিক পিছনে ওঁনারই মত খালি গায়ে, ধুতি পরা মাথা কামানো টিকিওলা ভৃত্য যার হাতে একটা বড় সিল্কের ছাতা প্রভুর



মহারাজা নবকৃষ্ণের ছবি (১৭৩২-১৭৯৭)

মাথার ওপর ধরা অবস্থায় রয়েছে। রাজার পায়ে খড়ম, গলায় বৈষ্ণবদের কণ্ঠি আর হাতে একটি ফুলও ধরা। চিত্রকর সযত্নে প্রভু ও ভৃত্যের গায়ের রঙে ফরসা এবং কালোর তফাৎ রেখেছেন, আর রাজার দেহের গড়নও কিছুটা মোটার ওপর। আমার অবাক লাগত এই ভেবে যে ওঁনার মতন একজন প্রতিপত্তিশালী লোক, যিনি খোদ লর্ড ক্লাইভের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁর পোশাক কি করে এত সাধারণ এবং একজন ব্রাহ্মণ পন্ডিতের মত হয়। পরে অবশ্য জানতে পেরেছি যে তিনি রোজ এই ভাবে গঙ্গায় চান করতে যেতেন, আর রাজদরবারে যাওয়ার আগে পোশাকআশাকের আমূল

বদল হয়ে যেত। আরও যে ছবিটা আমার কাছে ছেলেবেলায় বেশ কৌতূহল যোগাত, সেটা হচ্ছে রাজা দেবীকৃষ্ণের তৈলচিত্রটি একজন বেশ মোটাসোটা রাজকীয় পোশাক পরা মানুষের ছবিতে গলায় বড় বড় সাদা মুক্তোর মালা আর কোমরের কাছে ছোট একটা ধূসর রংএর ঠিক যেন ইঁদুরের মুখ, যা দেখে মনে হত যেন ঐ মালার মুক্তোটাকে খাচ্ছে। পরে আসল ব্যাপারটা এইরকম বোঝা গেছে যে রাজার কোমরে একটা ছোরা জাতীয় জিনিষ গোঁজা ছিল, যার হাতলটা ওপরের দিকে দেখে ঠিক একটা নেংটি ইঁদুরের মাথা বলে ভুল হত। আরেকটা রহস্যের বস্তু আছে; বৈঠকখানা ঘরের সামনে রাস্তার দিকের বারান্দায় ছোট একটা লোহার পাইপের মাথা মেঝের সঙ্গে গাঁথা। এর উৎস হচ্ছে পুরানো দিনে যখন টানা পাখার ব্যবস্থা ছিল, তখন ঐ পাইপের ভেতর দিয়ে পাখার দড়িটা একতলায় চলে যেত এবং প্রয়োজনে সেখানে বসে ঐ দড়ি টেনে বৈঠকখানার বাবুদের গায়ে হাওয়া লাগানোর কাজ চলত।

রাজা নবকৃষ্ণের পুরানো বাড়ি ও সংলগ্ন এলাকার যে সমস্ত অট্টালিকার বর্ণনা ও ছবি পাওয়া যায়, তার থেকে জানা গেছে যে বসতবাড়ির সঙ্গেই তাঁর লাইব্রেরি ও নাচঘর ছিল। তাঁর লাইব্রেরির সংগ্রহে যে সমস্ত দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান বই ও পুঁথি ছিল, ক'বছর আগে রাধাকান্ত দেবের ট্রাস্টের তরফ থেকে সমস্তই কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিকে দান করা হয়েছে। যদিও কিছু কিছু এর আগেই নষ্ট এবং চুরি হয়ে গেছে বলে শোনা যায়। আর নাচঘরের ভগ্নাবশেষ এখন কলিকাতা কর্পোরেশানের তত্ত্বাবধানে বর্তেছে। এ ছাড়া কাছারি বাড়ি, অতিথিশালা প্রভৃতি বাড়িগুলি একেবারে নিশ্চিহ্ন। কাছারি বাড়ির জায়গায় বাগবাজার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ (৫৫৫/৫৫৬) হয়েছে তা আগেই জানিয়েছি। একমাত্র পুরানো দিনের নিদর্শন হিসেবে রয়েছে সুতানুটির নাটমন্দির, যা এখন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের হেফাজতে ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। কমপক্ষে ২০০ বছরের পুরানো এই মন্দিরের এক ঐতিহাসিক ও সামাজিক চিত্র কলকাতা এবং বাঙ্গলার ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। আমার চোখের সামনে আজও পরিষ্কার দেখতে পাই সেই পুরানো দিনের বিশাল স্থাপত্য ও তার সংলগ্ন সুন্দর ফুলের বাগান, যার বর্তমান অবস্থা হচ্ছে জবরদখল একটি বিরাট গ্যারেজ আর কিছুটা ধ্বংসস্তূপ। আমাদের ১৮ নম্বর বাড়ির রাস্তার দিকে উত্তরমুখো যে বারান্দা, ঘর ও তিনতলার ছাদ, ঠিক তার উল্টোদিকেই দক্ষিণমুখী এই নাটমন্দির। তারজন্য বাইরে বাড়ির যে কোনও এক জায়গায় এসে দাঁড়ালেই প্রথমেই যা চোখে পড়বে, তা হল ঐ মন্দিরের গম্বুজের মতো চূড়াগুলি, নবরত্ন মন্দিরের যে কটি এখনও টিকে আছে। তার থেকেও দুঃখের বিষয় হল সেই সুন্দর বাগান একেবারে নিশ্চিহ্ন। আমার বেশ মনে আছে, রাধাকান্ত দেবের একজন বংশধর, যাঁকে আমরা রবিদাদু বলতাম, তিনি ঐ বাগানটিকে খুবই ভালবাসতেন এবং যতদিন জীবিত ছিলেন তাঁর চোখের সামনে কোন লোককে একটি ফুলও তুলতে দিতেন না। বাগান ও বাড়ি দেখাশোনার জন্য পুরানো মালি ও দরওয়ানরা

ছিল আর আমাদের সেই দাদুও তদারকি করতেন। একমাত্র দুপুর বেলায় তাঁর বিশ্রামের সময় আমরা মাঝে মাঝে সুযোগ বুঝে জামরুল চুরি করতুম। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় থাকলেও অত সুন্দব বড় বড় জামরুলের লোভ সামলাতে পারতুম না। ম্যাগনোলিয় গ্র্যান্ডিফ্লোরা গাছটাতে যখন ফুল ফুটত, তার গন্ধ আর সৌন্দর্য মাতিয়ে দিত। এ ছাড়াও ভাল ভাল গোলাপ, যুঁই, মাধবীলতা আরও কত কি গাছ ছিল। যাকে সত্যিকারের একটি সখের বাগান বলা যেত।

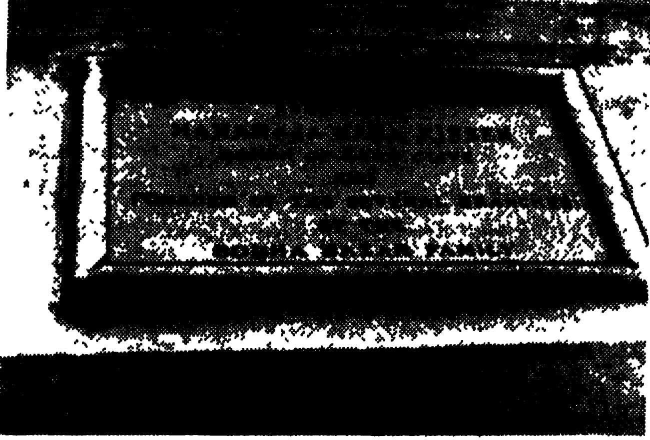
অনেক ছোটবেলায় নাটমন্দিরের ভেতরে বাড়ির বড়দের সঙ্গে যাত্রা/থিয়েটার দেখতে যেতুম। লম্বা লম্বা মোটা কাঠের পাটাতন আর ভারী লোহার পায়াওলা বেঞ্চির ওপর বসার ব্যবস্থা ছিল। বাড়ির মেয়েদের জায়গা ছিল দোতলায় জাফরি দেওয়া স্টেজের দু'দিকের ঘেরা ব্যালকনিতে। সত্যি কিনা জানতুম না (আজও জানিনা) ঐ মন্দিরের নীচ দিয়ে একটা নাকি সুরঙ্গ আছে যার ভেতর দিয়ে পায়ে হেঁটে গঙ্গার ঘাটে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের ছোটবয়সে ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় ছিল আর কী করে সেই গুপ্ত পথের সন্ধান পাওয়া যায় তাই নিয়ে গোপনে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতুম। বলা বাহুল্য সেই বিপদসংকুল অভিযান কখনও করা হয়ে ওঠেনি। এর অনেক বছর পরের ঘটনা হচ্ছে শোভাবাজার ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই মন্দিরের ভেতরে দু'পাশে আলাদা আলোর ব্যবস্থা করে সিমেন্টের বাঁধানো জায়গায় ব্যাডমিন্টনের কোর্ট কেটে সন্ধের পর থেকে রোজ খেলার চর্চা। এটাকে এক উচ্চমানের প্রশিক্ষণ শিবির বলা যেতে পারে। সেই সময়ের একেবারে সেরা খেলোয়াড়রা তখন এখানে নিয়মিত আসতেন, কারণ সেইরকম ব্যবস্থা কাছাকাছি আর কোথাও ছিল না আর এই পাড়ায় তখন একটা ব্যাডমিন্টন খেলার ভাল পরিবেশ তৈরী হয়েছিল। আমার এক ভাই সুকুমার দেব (পরে একজন বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন) তখন উদীয়মান প্রতিভা হিসেবে এই শিবিরে অনুশীলন করার সুযোগ পেয়েছে।

১৯৪৬ সালে বাঘওয়ালা বাড়ির ভেতরের মাঠে গড়ে উঠেছিল 'সব পেয়েছির আসর' নামে ছোটদের দল। সুভাষদা (ডাক নাম ভোম্বলদা) নামে আমাদের এক দাদা, যিনি ছোটদের কাছে 'নতুনদা' নামে সবার প্রিয় ছিলেন তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমে ও 'যুগান্তর' কাগজের পৃষ্ঠপোষকতায় এই আসর উত্তর কলকাতায় ক্রমশঃ খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এদের অনুষ্ঠানে বহু লোকের মধ্যে 'স্বপনবুড়ো' অর্থাৎ অখিল নিয়োগী মশাইকে প্রায় দেখতে পাওয়া যেত। এই আসরে আসাযাওয়া ছিল এমন একটি হাসিখুশী সুন্দর চেহারার ছেলেকে আজও বেশ মনে পড়ে, যিনি আজকের একজন বিখ্যাত আর্টিষ্ট বিকাশ ভট্টাচার্য। সেই 'নতুনদা' অকালে মারা যাবার পর থেকেই 'সব পেয়েছির আসর' আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল। এর বেশ কিছুদিন পর অশোক নামে একটি কলেজে পড়া ছাত্র ছোটদের নিয়ে কিছু কিছু অনুষ্ঠান শুরু করে। তারই পরিচালনায় নাটমন্দিরের ভেতরে সে একবার ছোটদের দিয়ে ঈশপের গল্প অবলম্বনে 'সিংহ ও খরগোস' অভিনয়

করায়। সমগ্র পরিবেশনার জন্য এটি বেশ উচ্চ মানের হয় আর বিশেষ করে খরগোসের কণ্ঠস্বর আমার শিশুপুত্র সুমিত্রর গলায় শুনে খুবই ভাল লেগেছিল। দুঃখের বিষয় কিছুদিনের মধ্যেই অশোককে কাজের তাগিদে দুর্গাপুর চলে যেতে হয় আর ঐ দলটিও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এরপর আস্তে আস্তে নবরত্ন মন্দিরের চুড়োগুলি এক এক করে ভেঙ্গে পড়তে লাগল। ইতিমধ্যে সামনের বাগানও একেবারে মাঠ হয়ে গেছে, বিকেলের দিকে কিছু ছেলেমেয়ের দলের ব্যান্ডবাজানো ও ড্রিল করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু হতে দেখিনি। তারপর দেখতুম বড় বড় ছেলেদের ফুটবল খেলা এবং কখনও আশপাশের দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক খেলার আয়োজন। পরবর্তীকালে দু'চারখানাকরে গাড়ি রাখা শুরু হয় এবং এখনকার পুরোদস্তুর গ্যারেজ তারই পরিণাম। দেখাশোনার অভাবে অনেক পুরানো অট্টালিকা যেভাবে নষ্ট হয়ে যায়, আমাদের স্মৃতিবিজড়িত নাটমন্দিরের সেই অবস্থাই দাঁড়াল। এক সময় যেখানে বহু জ্ঞানীগুনী লোকেরা জমায়েত হতেন, এমনকি স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশে ফেরার পর প্রথম যে নাগরিকসংবর্ধনার আয়োজন করা হয়, সেই জায়গাতে যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি সংগ্রহশালার রূপ দেওয়া হয়, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে তা গ্রহণ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

পুরানো কাছারি বাড়ি, অতিথিশালা বা অন্যান্য অট্টালিকাগুলি দেখার সুযোগ আমার হয়নি। তবে সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ পর্যন্ত টানা লম্বা ছাদ, যেটা নহবতখানার অংশ, ছেলেবেলায় আমার দেখা যার কোন কোন অংশে পরে গরুর খাটাল আর ঘোড়ার গাড়ি ও ঘোড়ার আস্তাবলের কথা মনে করতে পারি। এখন ১৮৫৬ সালের তৈরী ক্যালকাটা ডিরেক্টরি অনুযায়ী এই রাস্তার পুরানো বাসিন্দাদের কিছু পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।[১] পয়লা নম্বরটি ছিল বস্তি আর দ্বিতীয় নম্বরে থাকতেন মহারাজা ও রাজারা; শিবকৃষ্ণ, কালীকৃষ্ণ, দেবীকৃষ্ণ, অপূর্ব্বকৃষ্ণ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ এবং সদর দেওয়ানি আদালতের উকিল হরকালী ঘোষ। তিন নম্বরে থাকতেন রাজা শিবকৃষ্ণের দেওয়ান কৃষ্ণসখা ও কৃষ্ণজীবন ঘোষ। চার নম্বর বাড়িতে ছিলেন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলের নায়েব গোকুলকৃষ্ণ দেব, পাঁচ নম্বরে ওষুধের দোকান আবার ছয় নম্বরে বস্তি। সাত নম্বরে বাস করতেন হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়। আট নম্বরে থাকতেন বেনিয়ান গঙ্গারাম গাঙ্গুলী, নয় নম্বরে বস্তি, দশ নম্বরে অধ্যাত্মবিদ নবকুমার তর্কালংকার, এগার নম্বরে ছিলেন জমিদার মধুসূদন সিংঘি, বারো নম্বরে ছিল শ্যামপুকুর নামে একটি পুকুর। তেরো নম্বরে ছিলেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার অফিসের হেড কেরানি নবকৃষ্ণ রাহা যার নামে নবকৃষ্ণ রাহা লেন। চোদ্দ নম্বর বস্তি, পনের নম্বরে মুর্শিদাবাদের দেওয়ান রায় প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুর। সতের নম্বরে রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ি এবং ষোল আর আঠার নম্বরে ছিল আবার বস্তি। নবকৃষ্ণ ষ্ট্রিটের পুরসভার ওয়ার্ড নম্বর ১৯২৩ সালে ছিল এক, ১৯৫৩ সালে হয় আট ও নয়, ১৯৬৮ সাল থেকে হল আট, নয় ও দশ। ডাকঘরের এক্তিয়ার হাটখোলা যেটা হচ্ছে কলকাতা-৭০০ ০০৫, এই রাস্তার

পুরানো ও নতুন দুটো বাড়িই সুন্দর রচনাপ্রণালী, প্রশস্ত প্রবেশপথ, সাজসজ্জা ও ঐশ্বর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখন এই দুটো বাড়ির নম্বর যথাক্রমে ৩৫ ও ৩৬ নম্বর রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রিট। নতুন বাড়ির একদিকের ঢোকার দরজার মাথায় দেওয়ালে এখনও একটি মারবেল পাথরের ফলকে লেখা আছে ঃ "Here lived Maharaja Naba Kissen Deb Bahadur,Dewan of Lord Clive'. (লর্ড ক্লাইভের দেওয়ান মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই বাড়িতে থাকতেন।)

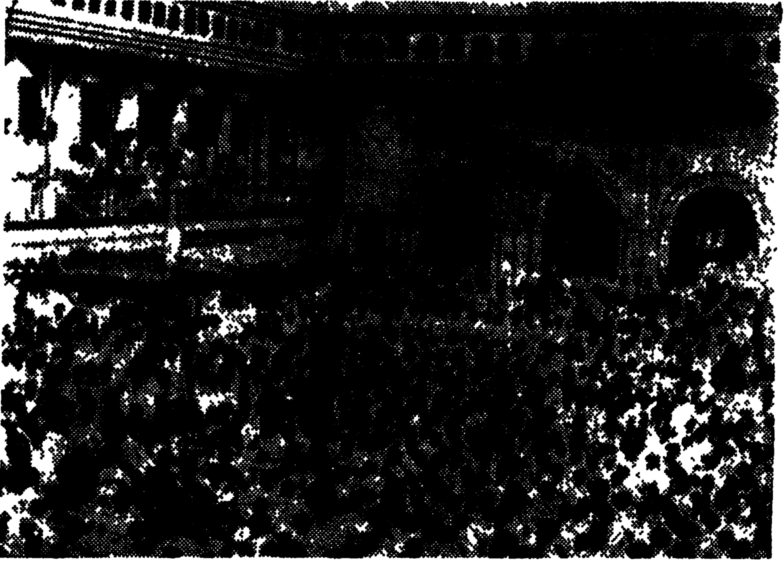


রাজা নবকৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই দুই বাড়িতে দুর্গাপূজো শুরু হয়েছিল যা আজও চলে আসছে, বলা বাহুল্য সেই পুরানো জৌলুস আর নেই। প্রথমটা আরম্ভ হয় ১৭৫৭ সালে, তারপর নতুন বাড়ি ও ঠাকুরদালান তৈরীর পর ১৭৮৯ সালে সেখানে দ্বিতীয় পূজো শুরু হল। আমি নতুন বাড়ির, অর্থাৎ রাজা রাজকৃষ্ণের উত্তরাধিকারী, সেই কারণে এই বাড়ির পূজাপার্বণ ও আরো অনেক অনুষ্ঠান দেখা বা বড়দের কাছে শোনার আমার সুযোগ হয়েছে। তাই এই লেখার মধ্যে তারই বর্ণনা প্রাধান্য পাবে। এই ঠাকুরবাড়ি, গোপীনাথ-রাধারাণীর বিগ্রহ, ঠাকুরদালান সংলগ্ন মাঠ উঠোন, চারপাশের সারি সারি ঘর, সবই আমাদের পরিবারের এক মহাসম্পদ। নিয়ম মাফিক পূজোআরতি ছাড়াও জন্মাষ্টমী, দোল, ঝুলন ইত্যাদি নানারকম ছোটবড় অনুষ্ঠান, যার তালিকা আগেই দিয়েছি, সবই হয়ে চলেছে; এ ছাড়া বাৎসরিক দুর্গাপূজোর আকর্ষণও রয়েছে। কিছুদিন ধরে দালানে বিয়ে, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কাজ হওয়াতে পারিবারিক যোগাযোগ আরও বাড়তে পেরেছে। রোজকার পূজো আর্চা ও ঠাকুরের যাবতীয় আনুষঙ্গিক কাজের জন্য আমাদের নিজস্ব পুরোহিত ও অন্যান্য কর্মচারীরা এই বাড়িতেই আশ্রিত এবং তাদের বাধা মাহিনার ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া ঠাকুরের ভোগ ইত্যাদির জন্য ভিয়েনের বামুনরা ও একটি বড় মাপের ভিয়েন ঘরও আছে। বংশপরম্পরায় আমাদের দুর্গাঠাকুর যে কুমোররা

তৈরী করে, কিছুদিন হল তার জন্যও একটা নির্দিষ্ট জায়গা দেওয়া হয়েছে। আমাদের বাবা কাকাদের সময় ঠাকুর বাড়ির মধ্যেই ক্লাব-ঘর ছিল এবং শুনেছি উঠোনের মাঠে লনটেনিস খেলা হত। শীতকালে আমরা নিয়মিত ব্যাডমিন্টন খেলতুম যা পরবর্তীকালেও বহুদিন পর্যন্ত চালু ছিল। আসলে এই পাড়ায় ব্যাডমিন্টন খেলার একটা ধারা বেশ কিছুদিন যাবৎই তৈরী হয়ে উঠেছিল। বেশ কয়েকবার এখানে All India Badminton Champion ship খেলার আয়োজন হয়েছে, যার পরিচালনার দায়িত্ব ছিল শোভাবাজার ব্যাডমিন্টন এ্যাসোসিয়েশনের ওপর। সারা বাঙ্গলার সেরা খেলোয়াড়রা ছাড়াও মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশের নামকরা খেলোয়াড় এবং সুদূর চীন, মালায়শিয়া প্রভৃতি জায়গা থেকেও অনেকে খেলতে আসত। বাঙ্গলার সুনীল বোস, মনোজ গুহ, গজানন হেমাডী, উত্তর ভারতের দাবিন্দার মোহন, লুইস, কেশব দত্ত, ডেনমার্কের আয়রল্যান্ড কপস, চীনের চীচুংকেন প্রভৃতি আরও অনেকের খেলা দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। এই পরিবেশে আমাদের বাড়ির অনেক ছেলেমেয়ে বেশ ভালই খেলতে পারত, এমনকি বাড়ির বউরাও কেউ কেউ আমাদের সঙ্গে খেলতেন। সেদিনগুলো আমাদের কি আনন্দেই কেটেছে, এর ভেতর দু'এক বছর আবার আমার এক কাকা পাশের বাড়িতে নিজের সখ মেটাতে ভাল ভাল টেবিল টেনিস প্লেয়ারদের বাড়িতে ও হোটেলে রেখে একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। বোধ হয় একা অত খরচের ভার বহন করা যুক্তিসঙ্গত হবে না ভেবে বন্ধ করে দিয়েছিল। তার পরে অনেকদিন পর্যন্ত আমরা সেই ফেলে রাখা দামী টেবিল টেনিস বোর্ডে খেলার সুযোগ পেয়েছি।

পুরোনো বাড়ির মাঠে সাধারণত বাড়ির এবং আশপাশের ছেলেরা ফুটবল খেলত। যতদূর মনে পড়ে ১৯৪৬ সালে কলকাতার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পর ওখানে শুরু হয় লাঠিখেলা শেখা। উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের বাঁচানো, তাই রীতিমত মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে একজন মাষ্টারমশাইয়ের কাছে নিয়মিত বিকেলবেলা আমরা বেশ কয়েকজন তাতে যোগ দিয়েছি। তবে ঐ মাঠের সবথেকে উল্লেখযোগ্য এবং ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে ফেরার পর তাঁকে প্রথম এই জায়গায় নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭ সালে। সৌভাগ্যবশতঃ সেই বিশাল সভার একটি প্রামান্য আলোকচিত্র কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে অতি যত্নসহকারে রাখা আছে, যার একটি কপি আমাদের ঠাকুরদালানেও রাখা সম্ভব হয়েছে। ছবিতে স্পষ্ট দেখা যায় অনেক সন্ন্যাসী, শহরের গন্যমান্য লোক, দেবপরিবারের অনেকে ও সাধারণ লোকের ভীড় একেবারে উপচে পড়ছে। সেই বিখ্যাত সভার সভাপতিত্ব করেন আমাদের পরিবারের কৃতী পুরুষ রাজা বিনয় কৃষ্ণ দেব বাহাদুর। ঐ ছবির নীচে উপস্থিত লোকের যে তালিকা দেওয়া আছে, তার থেকে

এই নামগুলি পাওয়া গেছে ঃ বিচারপতি শ্রী চন্দ্রমাধব ঘোষ, নাটোরের মহারাজা শ্রী জগদিন্দ্রনাথ রায়, রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব বাহাদুর, রাজা পিয়ারী মোহন মুখার্জী, কুমার গিরিন্দ্র নারায়ণ দেব বাহাদুর, কুমার অনাথ কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কুমার প্রমথ কৃষ্ণ



স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো থেকে ফেরার পর তাঁকে প্রথম এই জায়গায় নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল ২৮শে ফেব্রুয়ারী. ১৮৯৭

দেব বাহাদুর, কুমার সরোজেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কুমার কেশবেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কুমার বীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কুমার হেমেন্দ্র কৃষ্ণ, কুমার অশ্বিনী কুমার দেব বাহাদুর, কুমার সুরেন্দ্রনারায়ন দেব বাহাদুর, কুমার সুশীল কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কুমার নিত্যানন্দ সিং, রায় বাহাদুর কৈলাস চন্দ্র মুখার্জী, রায় বাহাদুর প্রসন্ন কুমার ব্যানার্জী, রায় বাহাদুর এস. এন. ঠাকুর, কুমার রাধাপ্রসাদ রায়, বাবু গুরুপ্রসন্ন ঘোষ, অক্ষয় কুমার ঘোষ, বাবু গুরুপ্রসাদ সেন, বাবু চন্দ্রনাথ বোস, বাবু জানকীনাথ রায়, বাবু হরেন্দ্রলাল রায়, বাবু বিনোদলাল রায়, "হোপ" সম্পাদক অমৃতলাল রায়, বাবু প্রিয়নাথ পালিত, বাবু এইচ. সি. মল্লিক, বাবু জে. ঘোষাল, বাবু নলিন বিহারী সরকার, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বোস, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রী নরেন্দ্র নাথ মিত্র, শ্রী গোঁসাই দাশগুপ্ত, সম্পাদক-সংবাদ প্রভাকর, শ্রী প্রিয়নাথ মুখার্জী, পন্ডিত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, ডাঃ বিপিন বিহারী ঘোষ, শ্রী গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, বিহারীলাল চ্যাটার্জী ম্যানেজার রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার, পন্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, বাবু ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর, শ্রী গনেন্দ্রনাথ

ঠাকুর, শ্রী বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রী সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রী শ্যামমাধব রায়, ডাঃ ডি.এল. চ্যাটার্জী, শ্রী গোকুল চন্দ্র ধর, রাধা কুমার কর, যোগেন্দ্র কৃষ্ণ বোস, ডাঃ আর.জি.কর, শ্রী প্রমথনাথ কর, ডাঃ নিশিকান্ত চ্যাটার্জী, শ্রী প্রসাদ দাস বড়াল, শ্রী বিনোদবিহারী বোস, শ্রী এন. সি. মল্লিক, শ্রী মহেন্দ্র নাথ রায়, শ্রী সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রী গোবিন্দ লাল দত্ত প্রভৃতি।

১৯৯৭ সালে ঐ সভার ১০০ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে সেই রাজবাড়ির মধ্যেই আবার এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, সে সভায় উপস্থিত হতে পেরে আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করেছি। সেদিনের অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশন এবং সুতানুটি পর্ষদের যৌথ উদ্যোগে, যে কারণে মিশনের অনেক সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী ছাড়াও বহু গন্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং বলা বাহুল্য সেদিনও ওখানে তিল ধারনের জায়গা ছিল না। এখন ঐ একই বাড়ির আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা জানাব। ১৯৬১ এবং ১৯৬৫ এই দুই বছরে বাঘওয়ালা বাড়ির মাঠে পনের দিন ধরে নিখিল বঙ্গ যাত্রা উৎসব আয়োজন করা হয়। এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে আমাদের সেই প্রায় হারিয়ে যেতে বসা সংস্কৃতির যে পুনরুজ্জীবন ঘটেছে তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে ঐ জায়গার স্থান-মাহাত্ম্য।

নবকৃষ্ণ ষ্ট্রিটের এই সব বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে আমার সুখস্মৃতিতে যা এখনও ভীষণভাবে উজ্জল তা হল ঠাকুরবাড়ির দুর্গোৎসব। নবকৃষ্ণ দেবের দুর্গাপূজো সম্বন্ধে পুরানো লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা যায়-''নবকৃষ্ণের প্রথম পারিবারিক বা সামাজিক কাজ দুর্গোৎসব ঃ ইহা সাত্তিক, তামসিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক এই চার প্রকার ছিল, মুক্তহস্তে ব্রাহ্মণ, দরিদ্র প্রভৃতিকে অর্থ, বস্ত্র, খাদ্যদ্রব্যাদি বিতরিত হইত। উৎসবে আত্মীয়স্বজন এবং নাগরিক হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি, আরমানি, ইংরাজ প্রভৃতিকে নিমন্ত্রন এবং যথোচিত অভ্যর্থনা। ১৫ দিন ব্যাপী নৃত্যগীত উৎসব চলিত। শারদীয় উৎসবে প্রধান শাসনকর্তা এবং অন্যান্য রাজপুরুষেরা উপস্থিত হইতেন'।'' এই বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় এই আয়োজন কত জাঁকজমক পূর্ণ ও ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। পুরানো কলকাতার দুর্গাপূজো সম্বন্ধে ডঃ অতুল সুরের লেখায় জানা যায় যে নবকৃষ্ণের পূজোবাড়িতেই কলকাতায় প্রথম সাহেবদের নিমন্ত্রন হয় এবং তাদের ভুরিভোজনে আপ্যায়ন ও নাচগান দেখার সুযোগও ছিল। কথিত আছে যে দুর্গোৎসবে বাইজীর নাচগান প্রথম প্রবর্তন করেন নদীয়ার মহারাজা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং পরে সেই ধারা নবকৃষ্ণের পূজোমন্ডপে প্রচলিত হয়। কোম্পানি ১৮৪০ সালে আইন করে ইংরেজদের দেশীয় লোকেদের বাড়িতে পূজোপার্বনে নিমন্ত্রন যাওয়া নিষেধ করে, তখন সাহেবদের আসা বন্ধ হলেও আমোদ-প্রমোদ কিছুই কমেনি।

এতক্ষণ দুর্গোৎসবের যে সব কথা বলা হল তার কিছুই আমার নিজের চোখে দেখার সুযোগ হয়নি। তবে ছেলেবেলায় এই পূজো উপলক্ষে যে মেলা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে তা ভোলার নয়। প্রথমেই বলি যে আমাদের এই নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে কোন সার্বজনীন বা ক্লাবের পূজো ছিলনা এবং এখনও শুরু হয়নি। এ রাস্তার বিভিন্ন সময় শুরু করা তিনখানা পূজোই ছিল বাড়ির, পুরানো বাড়ি, নতুন বাড়ি আর 'বৌ-রানীর বাড়ির পূজো। * ১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৮৮ পর্যন্ত পুরানো বাড়িতে একটা পূজো হত। নবকৃষ্ণের মা মারা যাবার পর রাজকৃষ্ণ ও গোপীমোহনের সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়। ১৭৮৯ সালে রাজার গৃহদেবতা গোপীনাথ-রাধারানীকে নবকৃষ্ণ 'নতুন বাড়িতে" নিয়ে এলেন, আর যতদূর জানা গেছে তখন থেকেই এ বাড়ি এবং ও বাড়ির পূজো আলাদা হয়ে গেল আর পুরানো বাড়ির ঠাকুরদালানে শ্রীশ্রী গোবিন্দজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এদিকে মহারাজা কমলকৃষ্ণ তাঁর বাড়িতে ১৮২২ সালে আলাদা আরেকটি পূজো শুরু করেন, সম্ভবতঃ পারিবারিক কিছু মনোমালিন্যের কারনে আলাদা এই ব্যবস্থা। যেহেতু এ বাড়িকে তাঁর স্ত্রীর নামে বৌরানীর বাড়ি বলা হত, পূজোটারও বৌরানীর পূজো নাম হল। কমলকৃষ্ণের ছেলে নীলকৃষ্ণের মেয়ে কৃষ্ণসুহাসিনীব বিয়ে হয় বোসেদের বাড়ি যারা পরবর্তীসময় নবকৃষ্ণ স্ট্রিটেই থাকতেন এবং অনেকদিন পর্যন্ত ঐ পূজো চালিয়েছিলেন। এই বাড়ির লোকেদের চালচলন খুবই রাজকীয় ছিল, যার বাড়াবাড়ি আমাদের চোখেও পড়েছে। কিন্তু বিষয়সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৪ সালে ঐ বিশাল বাড়ি বিক্রী হয়ে যায়, তার পর ১৯৪৫ এ ঐ বাড়িতেই জয়পুরিয়া কলেজের প্রতিষ্ঠা, শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়ার নামে। আস্তে আস্তে বাড়ির সব অংশগুলি ভেঙ্গে ফেলে এখনকার কলেজ ভবনের আকার ধারণ করেছে। ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এই কলেজের দ্বারোদঘাটন করেন সেই উপলক্ষে পাড়ায় এলাহি কান্ড কিছুটা আবছা মনে পড়ে। পরে আবার এ বাড়ির আলোচনায় ফিরে আসব।

দুর্গাপূজোর যে নিয়ম আচার ইত্যাদি শুরু হয়েছিল আজও তা যতটা সম্ভব মেনে চলা হয়। বড়তরফ এবং ছোট তরফের বাড়ির দুর্গাপ্রতিমা ঠাকুরদালানে কুমোরেরা বংশানুক্রমে তৈরী করে। প্রতিমার মাপজোখ একেবারে বাঁধা, উল্টোরথের দিন কাঠামো পূজো দিয়ে এর সূচনা। ঠাকুরের গায়ে ডাকের সাজ যা আগে কৃষ্ণনগর থেকে এনে পরানো হত। পিছনের চালচিত্রের ছবিগুলো পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে আঁকা হয়। কি কারণে ঠিক জানা নেই অনেক বছর থেকেই পুরানো বাড়ির

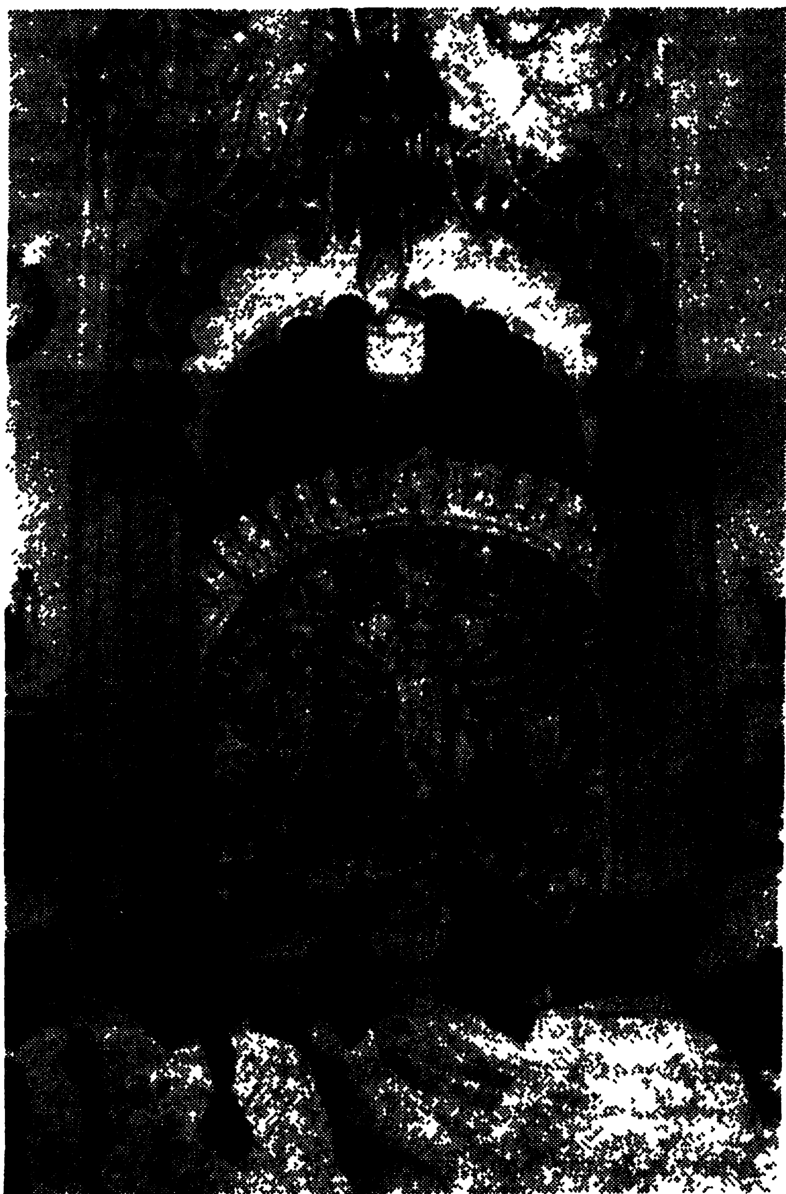
* ইন্দ্র নারায়ণ দেবের বাড়ির একতলার বাসিন্দা ডাঃ ব্যানার্জি তাঁদের পারিবারিক দুর্গাপূজো কয়েকবছর এখানে করেছিলেন, যার সঙ্গে দেববাড়ির কোন সম্পর্ক নেই।

ঠাকুরের মাপ সামান্য ছোট এবং ওদের সিংহের আকৃতি অনেকটা ঘোড়ার মতন। পূজোর নবমীর আগের নবমীর দিন বোধন বসে, সেদিন থেকে ব্রতী ব্রাহ্মণরা এসে ঠাকুর- দালানে পুজোর দিন পর্যন্ত চন্ডীপাঠ, বেদপাঠ, রামায়ণ, যজুর্বেদ, ঋগ্‌বেদ প্রভৃতি পাঠ করেন। ঐ দিন পন্ডিত বিদায় (প্রণামী) অনুষ্ঠান হয়, কলকাতা ও বাইরে থেকে অনেক ব্রাহ্মণ পন্ডিত আসেন। আমাদের বাড়ির পূজোয় কোনও অন্নভোগ হয় না। বাড়িতে "ভিয়েন" ঘরে তৈরী নানারকম "মিঠাই" ভোগ দেওয়া হয়। বড় তরফে রাজা রাধাকান্ত দেবের আমল থেকে পাঁঠা বলি বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু এ বাড়িতে এখনও চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।



বৌরাণীর বাড়ির দুর্গাপুজো

পূজোর ক'দিন দু'তরফের বংশধরেরা যে যার আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বেশীর ভাগ বাড়ির বিবাহিত মেয়েরা ছাড়াও, প্রবাসে কর্মরত পরিবারের লোকেরা



রাজা রাজকৃষ্ণের বাড়ির দুর্গাপুজো

ছুটিতে এখানে চলে আসে বলা যেতে পারে একটা বাৎসরিক পারিবারিক মিলন-মন্দির। দেববাড়ির শাখাপ্রশাখা এতই ছড়িয়ে এবং সংখ্যায় বেড়ে গেছে যে আজকাল একমাত্র পূজোর সময় সকালে অঞ্জলি বা সন্ধেবেলা আরতির সময় পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়। এই পূজো এবং ঠাকুরবাড়ি না থাকলে বোধ হয় আর এটুকু যোগাযোগ রাখাও হয়ে উঠত না। একটা ব্যাপার ভাবলে আমার কিছুটা অবাক লাগে যে আমাদের পাড়ার এই তিনখানা পূজোর মধ্যে ঐ বৌরাণীর বাড়ির ঠাকুর আমরা কোনদিন দেখিনি। শুনেছি আমার পিতৃস্থানীয়রা পূজোর মধ্যে একদিন ঐ বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে রূপোর বাসনে ভুরিভোজে আপ্যায়িত হতেন, যতদিন রাণীমা জীবিত ছিলেন।



বাঘওয়ালা বাড়ির দুর্গাপূজো

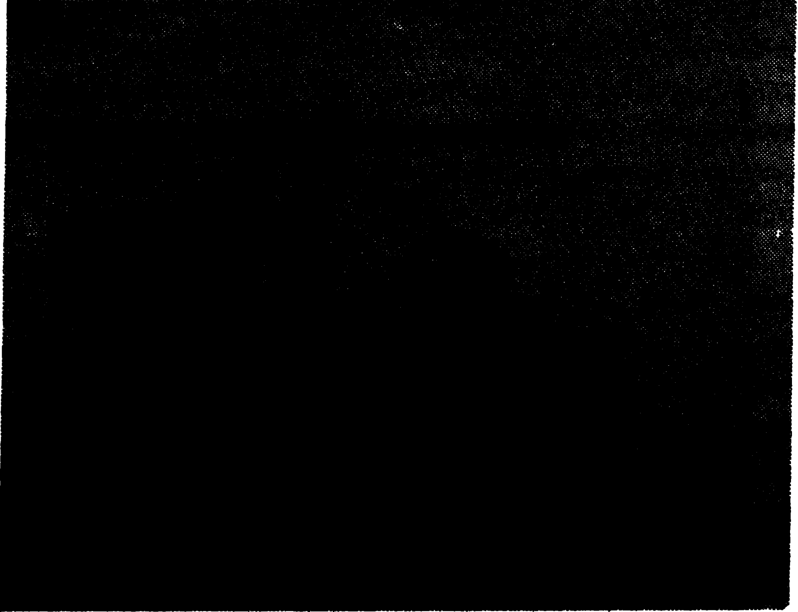
সন্ধিপূজো ঠাকুরের সামনে দালানে ১০৮টি প্রদীপ জ্বেলে শুরু করা হয়। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ঠিক পূজো আরম্ভ করার মুহূর্তে বাইরের দালানে বন্দুকের শব্দ করা হয়, শুনেছি আগে নাকি কামানের শব্দ হোত। প্রায় প্রতি বছরই ঐ পূজোর

সময় থাকত গভীর রাতের দিকে, তার ফলে সেখানে আমাদের ছোটদের দল উপস্থিত থাকতে পারতুম না। মাঝেমধ্যে যখন সন্ধের দিকে সময় নির্দিষ্ট থাকত তখন দালানে হাজির হতুম, প্রধান উদ্দেশ্য বন্দুকের আওয়াজ শোনা আর বন্দুকের চেহারাটা কাছ থেকে দেখার আগ্রহ। ঠিক পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী ভট্টাচার্য মশাই নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরের দালানে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়ির একজন প্রাপ্তবয়স্ক কাকা (শত্রুঘ্ন কাকা) আকাশের দিকে বন্দুকের নল লক্ষ্য করে ঐ কাজটি খুব দায়িত্ব সহকারে করতেন এবং বেশ গর্বের সঙ্গে তাঁর নিজের ঐ অস্ত্রটি নিয়ে বাড়িতে ফিরে যেতেন। আমাদের দুটো বাড়িরই আরও একটা বৈশিষ্টের কথা বলি, দুর্গা প্রতিমা ভাসানের সময় বাড়ি থেকে ঠিক যাত্রা করার সময় একটি নীলকণ্ঠ পাখি ছেড়ে শুরু এবং গঙ্গার ঘাটে নৌকায় ঠাকুর বিসর্জনের সময় দ্বিতীয় পাখিটাকে ছাড়া হয়। অনেক বছর থেকে জানাশোনা পাখিওয়ালা দু'বাড়ির জন্য চারটি এই বিশেষ পাখি ঠিক সময় যোগাড় করে আনে। পাখিগুলোকে ছাড়ার উদ্দেশ্য নাকি হিমালয়ে গিয়ে শিবকে সময়মত মা দুর্গার ঘরে ফেরার খবর দেওয়া। এই ব্যাপারটা আজকাল কিছুটা প্রচার হওয়াতে কিছু উৎসাহী আলোকচিত্রশিল্পী ঐ সময় ছবি তোলার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়েন এবং তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী ঐ পাখিটাকে খাঁচার বাইরে হাতে চেপে ধরে বেচারীকে কষ্ট দেওয়া হয়। আমার ইচ্ছে আছে এই অযৌক্তিক ধারাবাহিকতাটা বন্ধ করার।

পূজোর ক'টা দিন আরেক আকর্ষণ হচ্ছে ঠাকুরবাড়ির "ভিয়েন" ঘরে তৈরী অতি সুস্বাদু সব মিষ্টান্ন-খাজা, গজা, মেঠাই, পান্তুয়া প্রভৃতি যা বছরের অন্য সময় পাওয়া যায় না। এই মেঠাই জিনিষটি দুরকম হয়, এক সাদা মেঠাই যাকে বলে মতিচূর আর অন্যটি লাল মেঠাই। এ দুরকমই এক একটি ৫০০ গ্রাম ওজনের গোল আকার, ছোট কামানের গোলার চেহারা। সিঙ্গাড়া ও রাধাবল্লভীও তৈরী হয়, তবে মিঠে গজা নামের জিনিষটি একেবারে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে এবং স্বচ্ছন্দে মাসখানেক রেখে সুন্দর খাওয়া যায়। এখনও এসবের প্রচলন দু'বাড়িতেই আছে, তবে বলা বাহুল্য সেইরকম উৎকৃষ্ট জিনিষ আর এখন হয় না যদিও ভিয়েনের বামুনরা মোটামুটি বংশপরম্পরায় ঠাকুরবাড়িতে থেকে এই কাজ নিয়ে আছে। এই ধরনের খাবারের প্রয়োজন পূজোর সময় খুব বেশী পরিমানে থাকে, একদিকে ক'দিন দুর্গাঠাকুরের ভোগের জন্য আর অন্যদিকে বংশধরদের ও তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের চাহিদা মেটাতে। বাড়ির কিছু সাত্ত্বিক মহিলা এই সময় সাধারণ খাবারের বদলে এই সবই খেয়ে থাকেন। আজও পর্যন্ত এমন অনেকে আছেন যাঁরা সারা বছর এই খাবারের প্রতীক্ষায় থাকেন।

শক্তিমতে দুর্গাপূজো হয় বলে আমাদের দুই বাড়ির গৃহদেবতা স্থানান্তরিত করে সেখানে নিত্যসেবার আয়োজন করা হয়। শ্রীশ্রী গোপীনাথ জীউ ও রাধারাণীকে ভেতরের দালান থেকে সরিয়ে দোতলায় একটি প্রশস্ত জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। ওপরে নিয়ে যাওযা এবং দুর্গাপূজোর পর আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে আনার দিনক্ষণ একেবারে নির্দিষ্ট, ভাদ্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে ঠাকুরদালান ছেড়ে ওপরে ওঠেন, যে দিন মা দুর্গাকে পাঠশালা থেকে দালানে তোলা হয়, আর লক্ষ্মীপূজোর দিন আবার তাঁর নিজের জায়গায় নামানো হয়। আমাদের বাড়ির কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোয় আমরা মাটির প্রতিমা করি না, বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত যুগলমুর্তি (রাধাগোবিন্দ, গোপীনাথ-রাধারাণী) থেকে আমরা রাধারাণী দেবীকে ঐ দিন লক্ষ্মী হিসেবে সাজিয়ে পুজো করি।

এখন আমি ঠাকুর ভাসানের প্রসঙ্গে কিছু জানাব, যার বিশেষত্ব আজও পথচারীকে বেশ অবাক করে। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি দুপুর না গড়াতেই



বিসর্জন

দিনে দিনে আমাদের প্রতিমা বিসর্জনের তোড়জোড়। এ ব্যাপারে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে পুরানো বাড়ির ঠাকুর বরাবর আমাদের এ বাড়ির আগেই যাত্রা করে, বোধ হয় ওরা 'বড় তরফ' বলে। এ কাজের জন্য বেশ অধিক সংখ্যক বাহকের প্রয়োজন হয়, কারণ লোকের কাঁধে মোটা মোটা কয়েকখানা কাঠের বা বাঁশের গুঁড়ির ওপর ঠাকুর বসিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। বেশ জোয়ান বলিষ্ঠ

লোক, যারা আগে সবাই ওড়িষ্যা প্রদেশের হত, নারকেল দড়ি দিয়ে প্রতিমার কাঠামোর সঙ্গে সেই মোটা খুঁটিগুলো শক্ত করে বেঁধে ঐ বিরাট ও ভারী প্রতিমা কাঁধের ওপর তুলে নেয়। বাড়ির বড়রা সেই কাজে তদারকি করেন, কারণ পথে কোন অবস্থাতেই ঠাকুরকে আর মাটিতে নামানো নিষেধ। এই প্রসঙ্গে আরেকটা নিয়মের কথা জানাই। আমাদের পরিবারের কোন লোকের মৃতদেহ খাটে শোয়ানো অবস্থায় কাঁধে তোলার পরিবর্তে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুটা এই কষ্টকর পদ্ধতির ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হয় যে ঠাকুর কাঁধে তোলা হয় বলেই মৃতদেহের ব্যবস্থা আলাদা। বিসর্জনের এই শোভাযাত্রায় কাঁসর ঘন্টার সঙ্গে সেই পুরান আমলের ব্যান্ড পার্টিও থাকে, যারা কিছুদিন আগে পর্যন্ত "God Save The King" এই সুর বাজাত, এখন জাতীয় সঙ্গীত এবং অল্পবিস্তর জনপ্রিয় হিন্দী সিনেমার গানও বাজায়। বাড়ির কিছু বড়রা, বিভিন্ন বয়সের ছেলে এবং আজকাল কয়েক বছর মেয়েবউরাও পায়ে হেঁটে বা গাড়ী ও রিক্সা চেপে সঙ্গে সঙ্গে যায়।

বিসর্জনের শেষ অংশটুকুও বেশ উত্তেজনাপূর্ণ। গঙ্গার তীরে দুখানা বড় বজরা নৌকা এক সঙ্গে মোটা বাঁশ লাগিয়ে পাশাপাশি বেঁধে মাঝখানে বেশ খানিকটা ফাঁব রাখা হয়। দু'বাড়ির জন্য একই ব্যবস্থা আগে থেকেই বন্দোবস্ত করা থাকে। প্রতিমা গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাবার পর কুলিরা কাঁধ থেকে নামিয়ে ঘাটে সিঁড়ির ওপর নামিয়ে রাখে, মাঝিরা তখন জোড়া নৌকা দুটিকে ঘাটের কাছাকাছি নিয়ে আসে। তারপর বাহকরা ধরাধরি করে সেই বাঁশবাঁধা ফাঁকা জায়গাটার ওপর অতি কষ্টে ও প্রচুর পরিশ্রম করে ঠাকুরকে বসিয়ে রাখে। একজন ভট্টাচার্য মহাশয়, তাঁর সহকারী ও বাড়ির দু'একজন লোক সেই জোড়া নৌকার ওপর উঠে যায়। আস্তে আস্তে কিছুটা গভীর জলে মাঝ দরিয়ায় নৌকাকে চালিয়ে বাঁশের ওপর থেকে ঠাকুরের ভার মোটা দড়ির ওপর চাপিয়ে বাঁশ সরিয়ে ফেলে। সবশেষে ঐ দড়িগুলো আলগা করে ঠাকুরকে জলে নামিয়ে দিয়ে বিসর্জন। আমরা ঘাটের ওপর থেকে সেই দৃশ্য দেখতে পাই, আর মনের মধ্যে একটা বিষাদের ছায়া নেমে আসে বেশীর ভাগ সময়েই এই ব্যাপারটা শেষ হতে গঙ্গার তীরে সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসে, তখন দূর থেকে নৌকার ওপর ভাসমান অবস্থায় দুর্গাপ্রতিমা এক অপার্থিব দৃশ্যের অবতারনা করে। ঠাকুর জলের তলায় চলে গেলে আমরা গঙ্গার জল মাথায় ছিটিয়ে আবার দলবদ্ধ ভাবে ঠাকুরবাড়ির দিকে এগোতে থাকি। পথে একটা অবশ্য কাজ হচ্ছে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে এসে প্রণাম করা ও ঠাকুরের চরনামৃত মুখে দেওয়া। ঠাকুরবাড়ির দালানে এসে অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে যে যার বাড়ি ফিরি। চান সেরে নতুন ধুতিপাঞ্জাবি পরে বাড়িতে বাড়িতে ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছ থেকে শান্তিজল নেওয়া হয়, আর তার পরই বিজয়া শুরু। অবশ্য ঠাকুরবাড়ির দালানেও যৌথ ভাবে পরিবারবর্গের জন্য

শান্তিজল দেবার ব্যবস্থা থাকে যেখানে সাধারণতঃ বাড়ির সব বয়স্ক পুরুষেরা একসঙ্গে কুলপুরোহিতের কাছে এই কাজটা সারেন এবং সেখানেই নিজেদের মধ্যে আলিঙ্গন পর্বটা (কোলাকুলি) চুকিয়ে ফেলেন। শুনেছি তারপর দু'একটি বাড়িতে ঢালাও সিদ্ধির সরবৎ তৈরীর আয়োজন হত এবং উৎকৃষ্ট মিষ্টান্নের সহিত অনেকেই তার যথার্থ সদ্বব্যহার করতেন। যেহেতু সেখানে গুরুজনেরা উপস্থিত থাকতেন, আমাদের বয়সীদের সেখানে যাবার প্রশ্নই উঠত না। এর ফলে একমাত্র কানে শোনা ছাড়া এই ব্যাপারটার সঙ্গে আদৌ কোন অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়নি। আমাদের এই বিসর্জনের শোভাযাত্রা যে পথ ধরে গঙ্গার ঘাটে যায়, শুনেছি সেই সব রাস্তার ধারের পুরানো বাসিন্দারা ঐ সময়ের কিছু পর থেকে বিজয়ার শুরু হিসেবে মেনে নেয়।

সবশেষে পূজো উপলক্ষে নবকৃষ্ণ ষ্ট্রিটে আমার দেখা মেলার কথায় আসব। পূজো শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে থেকেই তখন মনের মধ্যে বেশ একটা আনন্দের অনুভূতি জাগত। নতুন জামা-প্যান্ট জুতো এইসব নিয়ে তেমন মাথা ব্যথা ছিল না। মনে মনে ভাবতুম এবারের মেলায় নতুন কি সার্কাস-ম্যাজিকের তাঁবু পড়বে, কি কি জিনিষের দোকান বসবে, পূজোর পার্বনীটা কবে হাতে পাব, ঠাকুরবাড়িতে থিয়েটার/যাত্রা হবে কিনা ইত্যাদি। আমাদের বাড়ির পশ্চিম দিকে সেন্ট্রাল এ্যাভেনিউ পর্যন্ত আর পূবদিকে ঠাকুরবাড়ি এটাই ছিল আমাদের তখন পূজোর ঘোরাফেরার এলাকা। সেই সময় 'পুরানোবাড়ি' সংলগ্ন উত্তর দিকের ফুটপাথের পেছনে মাঝে মাঝে বেশ কিছু ফাঁকা জায়গা ছিল। এখন সে সব জায়গায় দু'একটি দেবেদের ছাড়া অন্যান্য লোকেদের ঘর-বাড়ি-দোকান ইত্যাদিতে ভরে গেছে। যতদিন ঐ জায়গাগুলো ফাঁকা ছিল ততদিন পূজোর সময় সার্কাসের তাঁবু, ঘোড়ারদোলা, নাগরদোলা, ম্যাজিক শো ইত্যাদি ছোট বড় নানারকম জিনিষের দোকানে ভরে থাকত। দক্ষিণ দিকে সেরকম কোন ফাঁকা জায়গা না থাকায়, বিভিন্ন বাড়ির ঢোকার পথটা ছেড়ে ফুটপাতের ওপর পান, সরবৎ, লাঠিওলা, হাতগণনা, লটারি, বেলুন, বটতলার কিছু বই, মুখোশ, আলুরদম-ঘুগনী, চানাচুর, ফুচকা ইত্যাদিতে ভরে যেত। সার্কাস বা ম্যাজিক দেখার ফাঁকে ফাঁকে আমরা নাগর ও ঘোড়ার দোলায় চড়ে নিতুম। এই রাস্তায় পূজোর ক'দিন এত লোক চলাফেরা করত যে একমাত্র সকালে কিছুক্ষণ ছাড়া কোন গাড়ি-ঘোড়া এখানে ঢুকতে পারতনা। সন্ধেবেলা একেবারে লোকে লোকারণ্য, বাড়ির বারান্দা থেকে শুধু কালো কালো মাথা দেখা যেত অনেক সময় দল দল হিন্দুস্থানী লোক ঠাকুরবাড়িতে ঢুকে "জয় দুর্গা মাইকী জয়" এই চিৎকারে সমস্ত জায়গাটা ভরিয়ে তুলত, কিন্তু কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনার কথা শোনা যেতনা। নাগরদোলায় এত ভীড় থাকত যে একবার উঠে বসতে পেলে একনাগাড়ে ৩/৪ বার চড়ে মনের সাধ মিটিয়ে নিতুম। পার্বনীর টাকা খুব হিসেব করে চালাতে হত, যদিও

তখন ১/২/৪ আনায় অনেক কিছু শখ মেটাতে পারতুম। বাদশাহী পান (৩০/৩২ রকম মশলা দিয়ে তৈরী) বা বাইরণ কোম্পানির সোডা-লেমনেড খাওয়ার লোভ সামলান মুস্কিল ছিল। একটি মেয়ের দুটো মাথা, জ্যান্ত টিয়াপাখীর মুখ দিয়ে সুতোয় টান দিয়ে একটা ছোট পিতলের কামানে গুলি ছোঁড়া ইত্যাদি খেলা দেখানো এখনও চোখের সামনে পরিষ্কার রয়েছে। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিন দিনই সকালে ঠাকুরের অঞ্জলি দেওয়ার সময় কুলপুরোহিত অন্নদা ভট্টাচার্য মহাশয়ের উদাত্ত কণ্ঠস্বরে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ এক অন্য পরিবেশের সৃষ্টি করত। পরবর্তী সময়ে অনেক জায়গায় অন্যান্য পুরোহিতের গলায় মন্ত্র শোনার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু সেই পুরানো অনুভূতি পাওয়া যায়নি।

আমাদেব ছেলেবেলায় পূজোর সময় ২/৩ দিন ঠাকুরবাড়ির মাঠে মঞ্চ করে থিয়েটার হোত। মনে আছে, 'শাহজাহান', 'আবদুল্লা-মর্জিনা', এই ধরনের নাটকই মঞ্চস্থ হত, যাতে আমাদের বাড়ির লোকেরাই বেশী অংশ গ্রহণ করতেন। তাড়াতাড়ি করে রাতের খাওয়া শেষ করে বাড়ির বড়দের সঙ্গে গিয়ে সামনের দিকে চেয়ারে বসে পড়তুম। অনেকক্ষণ এরকম অপেক্ষা করার পর শুরু হবার সময় হলে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখতুম সমস্ত জায়গা একেবারে লোকে লোকারণ্য, থিয়েটার দেখতে দেখতে ঘুম এসে যেত। মাঝে মাঝে অভিনেতারা পাঠ ভুলে গেলে হাসির রোল উঠত, বা একেবারে পিছনের দিকে দাঁড়িয়ে থাকা বাইরের লোকেদের মধ্যে কিছু গোলমালের আওয়াজে জেগে উঠতুম। এ ছাড়া এবাড়ি-ওবাড়ির দু'একজন দাদু স্থানীয়রা এই সব উৎসবের মেজাজে অধিক সুরাপান করে কিছুটা বেসামাল হয়েও বিঘ্ন ঘটাতেন। ভোর হবার আগেই কোন দাদা-কাকার সঙ্গে বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়তুম। ১৯৪৪ সাল থেকে এ ধরনের নাটক/যাত্রা বন্ধ হয়ে গেছে। এরপর মাঝে মাঝে বাড়ির ছেলেরা নিজেদের উদ্যোগে কিছু নাটক মঞ্চস্থ করেছে আর বর্তমানেও সেই রকম চেষ্টা নেওয়া হয়। শ্রীশ্রী˘কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে শোভাবাজার নাট্যশালা দু'খানা নাটক মঞ্চস্থ করে, প্রথমে 'সাহজাহান' এবং পরে 'ডিটেকটিভ'। বলা বাহুল্য সব স্ত্রী-চরিত্রে পুরুষরাই অভিনয় করেছিলেন, তবে যন্ত্রসংগীতে রাজবাড়ির লোকেরা অংশ নেন এইটাই তখনকার মতন শেষবার।

˘বিজয়া দশমীর দিন নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে বেলার দিকে অবাঙ্গালী শ্রমিক শ্রেণীর লোকের খুব ভীড় হত, কারণ একমাত্র সেদিনই কলিকাতা কর্পোরেশনের রাস্তার ঝাড়ুদারেরা পূজোর একদিন ছুটি পেত। সকাল থেকেই সেদিন মন খারাপ, পূজোর মজা, হৈ হৈ শেষ। বড়দের সঙ্গে ঠাকুরদালানে গিয়ে ঠাকুরের পায়ের ধূলো নিতে হত। যখন একটু বড় হয়ে চৌকির ওপর বসানো প্রতিমা ছুঁতে পারতুম, বেশ মনে পড়ে তখন অসুর, সিংহ, এমনকি কার্তিক ঠাকুরের বাহন ময়ূরের পায়ে হাত

ঠেকাতেও কোন দ্বিধা করতুম না। বয়ঃজ্যেষ্ঠ কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতেন কার কার পায়ের ধুলো নিয়েছি, কাঁচুমাচু মুখ করে বলতে হত গণেশ ঠাকুরের নীচে রাখা ইঁদুরের পা খুঁজে পাইনি-এখন ভাবলে বেশ মজা লাগে।

কিছুদিন আগে 'সংবাদ প্রতিদিন' কাগজে পুরানো দিনের নাটক নিয়ে যে একটা লেখা বেরিয়েছিল, সেখানে এই 'শোভাবাজার নাট্যশালার' কথার উল্লেখ পাওয়া গেছে। জানা গেছে যে ১৮৬৫ সালেব ১৮ই ও ২৯শে জুলাই রাজা দেবীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরেব বাড়িতে মধুসূদনের সেই কালজয়ী প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' মঞ্চস্থ করা হয়। এই নাটকটি বেলগাছিয়াব বাগানবাড়ির বাবুরা মঞ্চস্থ করতে পাঁচ বছর আগে সাহস পাননি। দেবীকৃষ্ণের বাড়িতে যখন নাটকের আয়োজন হচ্ছে তখন স্যার বাধাকান্ত দেব এবং মধুসূদনও বেঁচে, কিন্তু বিদেশে ছিলেন বলে দর্শক হিসেবে থাকতে পারেননি। এই লেখা থেকে আরও জানা যায়, শুরুতে কালীপ্রসন্ন সিংহ এই নাট্যশালার সভাপতি ছিলেন, এছাড়া দর্শক আসনে থাকতেন দিগম্বর মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ কলকাতা শহরের গণ্যমান্যরা। আবার এমন অনেক দর্শকও ছিলেন যাদের সঙ্গে প্রহসনের অনেক চরিত্রের কিছু কিছু মিল ছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ৩১ জুলাই ১৮৬৫ সালের পত্রিকাব পাতায় অভিনয়ের প্রশংসা করে লিখেছিল, "শোভাবাজার নাট্যশালার নাম বেলগাছিয়া, পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকো থিয়েটারের ইতিহাসের সঙ্গে একই ভাবে আলোচিত হবে।" ১৮৬৭-র ৮ই ফেব্রুয়ারি এই নাটমঞ্চে দ্বিতীয়বার প্রযোজিত হয় সেই মধুসূদনেরই ১৮৬০ সালে লেখা নাটক "কৃষ্ণকুমারী"। এর নামভূমিকায় অভিনয় করেন কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, এবং সব মিলিয়ে এটি বেশ সফল প্রযোজনা হয়েছিল। এর পর কোন এক অজ্ঞাত কারণে 'শোভাবাজার নাট্যশালা' অনেক বছরের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

নবকৃষ্ণ ষ্ট্রিটের সেই পূজোর মেলা আস্তে আস্তে কমে আসে, আর এখন একেবারে শেষ। প্রথমতঃ সেই সব ফাঁকা জায়গা যেখানে তাঁবু পড়ত, নাগরদোলা প্রভৃতি জায়গা পেত, সেই সব জায়গায় এখন বাড়িঘর উঠেছে আর দ্বিতীয়তঃ আশেপাশে বেশ কিছু সর্বজনীন দুর্গাপূজো কয়েক বছর হল শুরু হয়েছে। এর সঙ্গে লোকের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টেছে, সেই পুরানো একচালার ডাকের সাজের প্রতিমা এখনকার লোকেদের তত আকর্ষণ করে না। মন্ডপসজ্জা, প্রতিমার দেহসৌষ্টব, আলোকসজ্জা, লাউডস্পিকারে আধুনিক গান ইত্যাদি এখন অনেক বেশী আকর্ষণীয়। এর ফলে মেলায় অংশগ্রহণকারী ব্যাপারীরা লাভের আশায় সেই সব পূজোর জায়গাতেই জড়ো হচ্ছে। তবে ফাঁকা জায়গার অভাব একটা বিশেষ কারণ। কিছুদিন যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগ এদিকে কিছুটা নজর দেওয়ার জন্য পূজোর

সময় তারা দিনের বেলা এবং সারারাত ধরে কলকাতার বিশিষ্ট কয়েকটি পূজামণ্ডপে তাদের নিজস্ব বিলাসবহুল বাসে করে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের আমাদের পাড়ার ঠাকুর দেখাতে নিয়ে আসে। কলকাতা দূরদর্শনও তাদের 'পূজাপরিক্রমা' এই পর্যায়ে এই সব প্রতিমার ছবি ও অন্যান্য কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করছে। সে দিক থেকে বিচার করলে এই সব গণমাধ্যমের সাহায্যে আজকাল প্রচারের কাজ অনেক বেড়েছে। আজকাল প্রায় দেখি বিদেশী পর্যটকরা তাদের ভিডিও ক্যামেরায় ঠাকুর পূজোর কোন কোন অংশ ধরে রাখার চেষ্টা করে। এ ছাড়া কম্পিউটার ইন্টারনেটের মাধ্যমে সুদূর ইউরোপ, আমেরিকার অধিবাসীরাও সেখানে বসে এখানকার অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পাচ্ছে।



বাঘওয়ালা বাড়ির ঠাকুর দালান

অনেক দেরী হয়ে গেলেও, শহরের অন্যান্য সব পুরাকীর্তির সঙ্গে আমাদের এই বাড়িগুলো, ঠাকুরদালান, নাটমন্দির ইত্যাদি সরকারের তরফ থেকে Heritage Building হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর ফলে এসমস্ত বাড়ি ইচ্ছেমত ভেঙ্গে ফেলা বা আমূল পরিবর্তন করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। সম্প্রতি কলিকাতা পুরসভা ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের সহায়তায় এই নাটমন্দির অধিগ্রহণ করে এটিকে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করার কাজে যুক্ত হয়েছে *। প্রয়াত ঐতিহাসিক ডঃ নিশীথ রঞ্জন রায় ও কিছু সমমনোভাবাপন্ন বিদগ্ধ মানুষের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই কাজটা সম্ভব হয়েছে। জানা গেছে যে রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের বিখ্যাত লাইব্রেরি, ঐ বাড়ির নাচঘর ইত্যাদি সংলগ্ন বর্তমান ভগ্নাবশেষ কলিকাতা পৌরসভা অধিগ্রহণ করে মিউজিয়াম বা ঐ ধরনের কোন ভাল কাজে ব্যবহার করবে। উভয় তরফের

উত্তরাধিকারীদের যে পুরানো বাড়িগুলো এখনও অবশিষ্ট আছে সেগুলি আমূল পরিবর্তন বা ভাঙ্গতে চাইলে কর্পোরেশনের অনুমতির প্রয়োজন হবে। এই নিয়মটা ঠিকমত কাজে লাগালে শহরের অনেক প্রাচীন নিদর্শন এখনও প্রোমোটার শ্রেণীর হাত থেকে বাঁচান যেতে পারে। ঠাকুরবাড়ি দুটোর ব্যাপারে খুব দুশ্চিন্তার কারণ নেই, কারণ এগুলি 'দেবত্তোর' সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা আছে।



স্যার রাধাকান্ত দেবের ঠাকুর দালান

এই রাস্তার তৃতীয় যে দুর্গাপুজোর কথা বলেছি, তা হোত বৌরানীর বাড়িতে যেটা কমলকৃষ্ণ দেব প্রথম শুরু করেন ১৮২২ সালে। শোনা যায় ভায়ে ভায়ে মনোমালিন্য হওয়াতেই নাকি এই পুজোর সূত্রপাত।* পরবর্তী সময়ে এই বাড়ির ছেলেদের চাল চলন এবং জীবনধারা যা আমার চোখে পড়েছে তা খুবই আতিশয্য ও খামখেয়ালের পরিচয় দিত। যারই ফলশ্রুতিতে বোধ হয় দেনার দায়ে ঐ বিশাল বাড়িটা ১৯৪৫ সাল নাগাদ শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়ার কাছে বিক্রী হয়ে যায় এবং বর্তমান জয়পুরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু যার উদ্বোধন করেন। ওদের বাড়ির পূজো আগেই বন্ধ হয়ে যায়, সম্ভবত ১৯৪৪ সালে। মনে আছে, আমাদের ঠাকুরবাড়িতে যখন শোভাবাজার ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত বড় বড় প্রতিযোগিতামূলক খেলা চলত, তখন কিছু সময়ের জন্য ঐ বাড়ির ভিতরে একটি বড় বাঁধানো উঠোনেও উচ্চস্তরের খেলার আয়োজন ছিল। এ সব থেকে মনে হয় দেববাড়ির সঙ্গে ওদের একটা রেষারিষির ভাব বজায় ছিল।

*বৌরানীর বাড়ির পূজো ছাড়াও, পরে কোন সময়ে রাজা বিনয়কৃষ্ণ তাঁর গ্রে স্ট্রিট ও সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ এর মোড়ের বাড়িতে কিছুদিন আলাদা একটা পূজো করেন।

আমাদের 'পুরানো' ও 'নতুন' বাড়ির সামাজিক রীতি ও পূজাপদ্ধতির কিছু বৈশিষ্ট ছিল। প্রতিমা বিসর্জনের সময় কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া এবং শবদেহ হাতে ঝুলিয়ে গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার কথা আগেই বলেছি। দুর্গাপূজোর সময় ছাগবলি রাজা রাধাকান্ত দেবের সময় থেকেই ঐ বাড়িতে বন্ধ হয়ে গেছে। রাজা রাজকৃষ্ণের ঠাকুর বাড়িতে অনাথ কৃষ্ণ একবার বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি সফল হতে



রাজা রাজকৃষ্ণের ঠাকুরদালান (ভিতরের দিক)

পারেননি। বর্তমান লেখক ১৯৯৯ সালে একটা উদ্যোগ নেয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় নিত্য সেবা কমিটির সভ্যদের মধ্যেই এর সমর্থন পাওয়া যায়নি। জন্মের পর ছ'দিনের দিন যে পূজা হয় তাতে তখন তরওয়াল থাকত, আর ছেলেরা বিয়ে করতে যাবার সময় যে সঙ্গে তরওয়াল নিত তাও রাধাকান্ত দেবের নির্দেশে বন্ধ হয়ে যায়। বিয়ের রাতে বউরা সিঁদুর পরতে পারবেনা, নিজের বাড়ি এলে ফুলশয্যার দিন কুশণ্ডিকা হবে। যদি ফুলশয্যার দিনটা মঙ্গল বা শনিবার হয়, তাহলে বাসি বিয়ের দিন কুশণ্ডিকা হবে আর সেদিন সিঁদুর পরতে পারবে। আরেকটা নিয়ম মেয়ের বাবা কন্যা সম্প্রদান করবেন না, কারণ হাঁটুতে হাত দিয়ে জামাই বরণ করতে হয়, তাই মেয়ের পিতৃস্থানীয় কেউ সম্প্রদান করবে। ঐ একই কারণে মেয়ের মাও বরণ করবেননা, সেখানেও কোন মাতৃস্থানীয়া ঐ কাজটা করবেন। আমাদের বাড়িতে বিয়ের পর সুবচনী পূজো হয়, 'পুরানো' বাড়িতে নেই। আজকাল অবশ্য এ সব নিয়মকানুন খুব নিষ্ঠার সঙ্গে বোধ হয় মানা হয় না। সেদিনের সেই বৈভব আর নেই, তবে সমস্ত রকম পূজানুষ্ঠানের মধ্যে বাহুল্য না থাক আন্তরিকতা আছে।

আমাদের দুবাড়িতেই ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ ও চৈত্র এই চার মাসের শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপূজো 'চাল' দিয়ে হয়, ধানে নয়। ধানের লক্ষ্মী প্রত্যেক পৌষ মাসে একবার বদল হয়, কিন্তু চালের লক্ষ্মী প্রতি দফায় বদল হয়। পৌষমাসে নতুন চাল দিয়ে হয়। বড় কুনকেতে কুবের দেওয়া হয় আর বাটিতে লক্ষ্মী পাতা হয়। বাটি ও কুনকের মধ্যে ১৭টা দিশি পানের গোছা আখের খোসা দিয়ে আটকানো থাকে। দুটো ছোট কড়ি, দুখানা সুপূরি আর একটা সিদুরকৌটা থাকে। কার্তিক মাসে ঘটে আমডাল থাকে, অন্যগুলোয় পান থাকে। আগেই জানিয়েছি রাধারাণীকে কোজাগরী লক্ষ্মী করে বরাবর পূজো করা হয়। 'পুরানো' বাড়িতে দোল-পূর্ণিমার দিন রাধাগোবিন্দজীর দোল (রং) খেলা হয়না। পূর্ণিমার পরের দিন ওদের দোল, যার জন্য চতুর্দশী এবং পূর্ণিমায় চাঁচর পোড়ানো হয়। এর জন্য ছোটবেলায় আমাদের যে একটা ভয় ছিল তার কথা মনে পড়ছে। দোলের পরের দিন আমি যখন স্কুলে যাব বলে পরিষ্কার জামা পরে বাড়ি থেকে রওনা হতুম, তখন 'পুরানো' বাড়ির ছেলেরা রং খেলত বলে পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যেত হত, পাছে স্কুলে গিয়ে বকুনি খেতে হয়।

গত শতকের মাঝামাঝি সময়েও শোভাবাজার রাজবাড়িতে যে জামাইষষ্ঠী দারুণ ধূমধাম করে হত, তার গল্প বাড়িতে ঠাকুমার কাছে কিছু শুনেছি। ১৯শে জুন, ১৯৯৯ 'বর্তমান' কাগজে জনৈক দীপ্তদীপ রায়ের লেখা থেকে অনেক কিছু জানা গেল। প্রতি বছর জামাইষষ্ঠীর দিন এই বাড়ি থেকে জামাইদের বাড়িতে তত্ত্ব পাঠানো হত। জামাইয়ের জন্য তত্ত্বে থাকত চুনোট করা ধুতি আর গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি, আর মেয়ের জন্য পাঠানো হত তাদের পছন্দমত শাড়ি। শুধু মেয়েজামাইয়ের জন্য নয়, গোটা কুটুমবাড়ির লোকেদের জন্য পোশাক থাকত; দাসদাসীরাও বাদ যেতনা। প্রায় ৫০-৬০ জন লোক এই তত্ত্ব নিয়ে জামাইয়ের বাড়ি যেত। রঙিন সেলোফেন কাগজে তত্ত্বের ঝুড়িগুলি মোড়া থাকত আর তার মধ্যে সুগন্ধি দেওয়া হোত। জামা-কাপড় ছাড়াও বিভিন্ন ঝুড়িতে সাজানো থাকত প্রসাধন সামগ্রী, নোনতা খাবার, রকমারি মিষ্টি, ৫ রকম ফল, খই-মুড়কি-বড় বড় বাতাসা আর খোদ মুর্শিদাবাদ থেকে আনা একেবারে সেরা আম, তত্ত্ব পাঠিয়ে দেবার পরই শুরু হয়ে যেত রাতের খাওয়া-দাওয়ার তোড়জোড়। ঠাকুরবাড়ির মাঠে বিরাট প্যান্ডেল করে সন্ধেবেলা থেকে বসত খানাপিনার আসর। শোনা যায় জামাইরা নাকি সে সময় পেশাদার খাইয়েদের সঙ্গে করে আনত যাদের খাওয়া দেখলে মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম হোত। এ ছাড়া সারারাত ধরে যাত্রারও ব্যবস্থা থাকত।

এদিনের এই বিরাট আয়োজনের মধ্যে বাড়ির মেয়েবউরা কিছুটা বঞ্চিত হোত, কারণ সেদিন তাদের আমিষ খাওয়া বারণ থাকত। ষষ্ঠীর ফলার-মিষ্টি খেতে হোত,

অবশ্য পরে একদিন আবার খাওয়াদাওয়া হোত আর জামাই-কুটুমরাও যোগ দিত। এটা শুধু জামাইষষ্ঠী বলে নয়। আমাদের বাড়িতে বিয়ের দিন, সরস্বতী পুজো, ভাই-ফোঁটা এইসব বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে নিরামিষ খাওয়ারই নিয়ম। অন্য দিনগুলির ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিল হলেও মেয়ের বিয়ের দিনে এখনও পর্য্যন্ত আমিষের চলন হয়নি, এমনকি বরযাত্রীদের ক্ষেত্রেও।

জামাইষষ্ঠীর দিন খাওয়ার মেনুতে তোপসে মাছের ফ্রাই একেবারে থাকবেই, এর সঙ্গে অন্য ৬/৭ রকমের মাছ থাকত। নানারকমের মাছের রান্নার সঙ্গে হোত কয়েকটা স্পেশ্যাল নিরামিষ তরকারী। ভাতের বদলে থাকত ঘি চপচপে পোলাও। এর সঙ্গে সাতআট রকমের মিষ্টি আর ক্ষীর ও রাবড়ি যা না খেলে কাউকে উঠতে দেওয়া হোত না। ফলও বাদ থাকত না, ৭/৮ রকমের ফল নানারকম নকশা করে কেটে সাজিয়ে দেওয়ার প্রথা ছিল। জমিদারি চলে যাবার পর এসব আজ কেবল স্মৃতি।

তখনকার দিনে জমিদারেরা যে শুধু নিজের বাড়িতে এমন উৎসব পালন করতেন তা নয়, অভিজাতদের নানারকম খেয়াল-খুশীর সঙ্গে আরেকটি খেলা ছিল বৈভবকে টেক্কা দেওয়া বৈভব দেখিয়ে। এরকম একটি ঘটনার কথা এখন সংক্ষেপে লিখব যা ৮ই এপ্রিল, ৭১ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় জনৈক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা গেছে। হাটখোলার চূড়োমনি দত্তর সঙ্গে নবকৃষ্ণের একটা রেষারেষি ছিল। শোভাবাজার রাজবাড়ির এক অনুষ্ঠানে নবকৃষ্ণকে টেক্কা দেবার জন্য ঐ চূড়োমনি দত্ত কি করেছিলেন তারই বর্ণনা লেখাটিতে দেওয়া হয়েছে। শোভাবাজারের শোভা সেদিন নাকি দেখবার মতন ছিল। বাড়ি সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, আলোয় ঝলমল করছে প্রাসাদ, ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে, বহুমূল্য গালিচা পাতা আর কিংখাপ ও মসলন্দের ছড়াছড়ি। অতিথিরা সব একে একে এলে ঐ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ আর নবকৃষ্ণ নিজেও বিগলিত। চূড়োমনির মেয়ে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপর লাল রঙের সামিয়ানার রং পাল্টে হয়ে গেল ময়ূরপঙ্খী, তার থেকে যেন আলো ঠিকরে পড়ছে। সবাই হতবাক; নবকৃষ্ণ খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, ঐ মেয়েটির হাতে একটি নীলকান্ত মণির আংটি ছিল যার জন্য আলোকোজ্জ্বল সভার রং পাল্টে গেছে। নবকৃষ্ণ সেই আংটি দেখে খুব প্রশংসা করলেন। আর মেয়ে বাড়ি ফিরে তার বাবাকে ঘটনাটি জানাল। পরের দিন রাজাকে জব্দ করার জন্য চূড়ো দত্ত কিছু উপঢৌকনের সঙ্গে ঐ আংটিটিও পাঠিয়ে দেন।

আরেকটি ঘটনাও ঐ শোভাবাজারের। রাজবাড়িতে জলসা হবে, বিরাট আয়োজন। শহরের বড় বড় লোক নিমন্ত্রিত, তাঁদের মধ্যে আছেন প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ

ঠাকুরও। যদিও দেবেন্দ্রনাথ তখন দ্বারকানাথের মৃত্যুর ঋণের ভাবে ডুবে আছেন। তিনি এক জহুরীকে দিয়ে মখমলের এক জোড়া জুতো তৈরী করালেন মুক্তোর দানা দিয়ে। সেদিনের অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা গেল এক জোড়া সাদা আচকান, সাদা পাগড়ি, কোথাও জরি কিংখাপের নামগন্ধ নেই। কৌচের ওপর পা দুখানি একটু বের করে বসে আছেন আর পায়ে সেই মুক্তো বসানো জুতো। শোভাবাজারের রাজা ছিলেন দেবেন্দ্রের গুণগ্রাহী, উনি নাকি মন্তব্য করেছিলেন - ''আমরা যা গলায় মাথায় ঝুলিয়েছি, উনি তা পায়ে রেখেছেন।''

বেশ কয়েকবছর থেকে আমাদের ঠাকুরবাড়িতে একটা নতুন অনুষ্ঠান সংযোজিত হয়েছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'শ্রীশ্রী গোপীনাথের জন্মজয়ন্তী।' এটা শুরু করেছে নিত্যসেবা কমিটির সদস্যরা এবং বাড়ির কিছু উৎসাহী লোক। ব্যাপারটা কতকটা শুভ জন্মদিনেরই মতন, তবে এ ক্ষেত্রে তিথিনক্ষত্র মেনে। ১৭৬৩/৬৪ সালে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে নবকৃষ্ণ তাঁর গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে গৃহদেবতাকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিশেষ পুজো হয় এই ব্যবস্থাই চলে আসছিল, আর কোন অনুষ্ঠান ছিল না। সেবাইতদের উদ্যোগে এবং নীরেন্দ্রকৃষ্ণ, হিতেন্দ্রকৃষ্ণ, বারীন্দ্রকৃষ্ণ, অজিতকৃষ্ণ, জিতেন্দ্রকৃষ্ণ, অলককৃষ্ণ ও অমল নারায়ণের সক্রিয় সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানকে বিশেষ ভাবে পালন করার রেওয়াজ শুরু হয়। অনেকের আর্থিক সহায়তায় তিন দিন ধরে কীর্তন, ভক্তিমূলক গান, বিশেষ ভোগ ইত্যাদি চালু হয়। ১৯৮৮ সাল থেকে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া শুরু হয়েছে। দুর্গাপুজো ছাড়া এটাই এখন আমাদের সব থেকে বড় পারিবারিক মিলনোৎসব। সেই পুরানো একান্নবর্তী পরিবারের আবহাওয়াটা পাওয়া যায়, এই ২০০০ সালেও ঠাকুরবাড়িতে তিনশোর বেশী লোক খুব আনন্দের সঙ্গে দিনের বেলা পঙতিতে বসে খাওয়া উপভোগ করেছে। অবশ্য এই খাওয়াদাওয়াব দিনটায় সকলের অংশ গ্রহণের জন্য রবিবার বা কোন ছুটির দিনে ব্যবস্থা করা হয়। এমনকি যাঁরা শারীরিক বা অন্য কোন কারণে নিজেরা খেতে আসতে পারেননা, তাঁদের বাড়িতে খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গোপীনাথের দয়ায় এবং সকলের আর্থিক সাহায্যে এই কাজ হতে পারে, তবে তিন দিন যাবৎ অনুষ্ঠান চালানো ইদানীং আর সম্ভব ই হচ্ছে না।

দ্বিতীয় পর্ব

মহারাজা নবকৃষ্ণদেবের উত্তরাধিকারীবৃন্দ

এক

নবকৃষ্ণ দেবের পরবর্তী যুগে শোভাবাজার দেবপরিবারের কয়েকজন স্বনামধন্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের কথা মনে করলে সব থেকে প্রথমেই যাঁর নাম মনে পড়ে তিনি হচ্ছেন রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর K.C.S.I. (Knight Commander of The Star of India) ; ৩০শে এপ্রিল, ১৮৬৬ সালে আগ্রার দরবারে প্রথম ভারতীয় হিসাবে স্বয়ং মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে বহুমুখী গুণাবলীর জন্য রাধাকান্ত এই উপাধি পান। রাজা নবকৃষ্ণের দত্তক পুত্র গোপীমোহন দেবের একমাত্র সন্তান রাধাকান্তর জন্ম ১০ই মার্চ, ১৭৮৪ (বিকল্প মতে '৮৩) সাল, কলকাতার সিমলা অঞ্চলে তাঁর মামার বাড়িতে। পাঁচ বছর বয়স থেকে গৃহশিক্ষক কৃষ্ণমোহন বসুর কাছে দেশীয় ভাষা শেখার সঙ্গে সঙ্গে আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষা শুরু করেন। মাত্র দশ বছর বয়সে গোপীনগরের রামকান্ত সিংহের মেয়ে গঙ্গামনির সঙ্গে রাধাকান্তর বিয়ে হয়। এর কিছু পরে তিনি মি: কামিংসের ক্যালকাটা একাডেমিতে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম পাঠ আরম্ভ করেন। রাজা নবকৃষ্ণ তাঁর নাতিকে ১০-১১ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। পিতামহের আদর্শ তাঁর কর্মজীবনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। নিজের বিদ্যাবুদ্ধির জোরে তিনি রাজা উপাধি পান, রাজা নবকৃষ্ণের প্রভাবে নয়। কায়স্থ সমাজের কুলপতি এবং বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক হয়েও রাধাকান্ত সেই সময়ের তুলনায় অনেক বেশী শিক্ষালাভ করেছিলেন। বাঙ্গলা, সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজীতে তাঁর সমান দখল ছিল। শিক্ষা এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে রাধাকান্ত দেবকে বাঙ্গলা তথা ভারতীয় রেনেসাঁসের একজন প্রধান স্তম্ভ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা, সংস্কৃত কলেজ, স্কুল বুক সোসাইটি, মেয়েদের স্কুল, সংস্কৃত অভিধান প্রভৃতি কাজকর্মে তাঁর সুস্থ এবং প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। মাতৃভাষার সাহায্যে বাঙ্গালীকে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা দেওয়ার কথা তিনি সেই যুগেই উপলব্ধি করেছিলেন। প্রায় ৪০ বছরের পরিশ্রমে সংস্কৃত অভিধান "শব্দকল্পদ্রুম" তাঁর অসামান্য কাজ। আটটি খণ্ডে প্রকাশিত এই অভিধানটির জন্য তিনি মোট ১৬ লক্ষ টাকা খরচ করেন[৬]।

"শব্দকল্পদ্রুমে" সংস্কৃত শব্দার্থ, বিশ্বকোষের মত বিশদ ব্যাখ্যা এবং একই সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের সব বিভাগের নির্ঘণ্ট রয়েছে। এই কাজটা ভাল ভাবে করার জন্য তিনি নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন, প্রয়োজনীয় টাইপ নির্মান ও ঢালাই করান; ঐ

ধরনের অক্ষরকে এখনও রাজা টাইপ বলে অভিহিত করা হয়। ১৮১৫ সালে শব্দকল্পদ্রুমের প্রথম খণ্ডের সংকলন কাজ শুরু হবার পর ১৮২২ এ এই খণ্ডের প্রকাশ হয় এবং ১৮৫৮ সালে পরিশিষ্ট খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। আর সেই সঙ্গে এই কালজয়ী অভিধানের কাজ শেষ হয়। তিনি যে সমস্ত দেশে সংস্কৃত চর্চা ছিল সেই সব জায়গার নামকরা প্রতিষ্ঠানে অভিধানটি বিনামূল্যে বিতরণ করেন। ২৮শে জুলাই, ১৮৫৯ সালে



রাজা স্যার রাধাকান্ত (১৭৮৪-১৮৬৭)

ইংলন্ডেশ্বরী রানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে স্বর্ণপদক উপহার দেন, যার এক পিঠে আঁকা ছিল মহারানীর মুখ আর অপর পিঠে লেখা ছিল 'রানী ভিক্টোরিয়ার নিকট হইতে রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরকে।'


রাজা গোপীমোহন (১৭৬৩-১৮৩৭)

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়ে সে যুগের যে কয়েকজন বিদ্যানুরাগী এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, রাধাকান্ত দেব তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ডেভিড হেয়ারের এই পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করতে যাঁরা আন্তরিক ভাবে সাহায্য করেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় রাজা গোপীমোহন দেব ও তাঁর পুত্র রাধাকান্তের। প্রেসিডেন্সি কলেজে কলা বিভাগের লাইব্রেরির দেওয়ালে মারবেল ফলকে আজও যে লেখাটি রয়েছে তার মধ্যে আরও তিনজনের সঙ্গে রাজা গোপীমোহন দেবের নাম আছে। প্রথম থেকেই গোপীমোহন দেব কলেজের ডিরেক্টার নিযুক্ত হন আর রাধাকান্ত হন ১৮১৮ সালে। শুরু থেকে দীর্ঘ ৩৫ বছর তিনি এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। পরিচালক সমিতির সদস্য হিসেবে তিনি এইচ. এইচ. উলসনকেসাহায্য করেন যাতে প্রতিষ্ঠানের সর্বতোভাবে উন্নতি হয়। তিনি গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের অবৈতনিক সম্পাদক ও পরীক্ষকও ছিলেন। এ ছাড়া স্ত্রীশিক্ষা প্রসারেও তাঁর অবদান অসামান্য। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রায় একই সময়ে রাধাকান্ত নিজের বাড়িতেই একটি মেয়েদের স্কুল স্থাপন করেন। তাঁর বাগানবাড়িতে মাঝে মাঝে ছাত্রদের পরীক্ষা নেওয়া হোত এবং তাদের উৎসাহ দেবার জন্য 'প্রাইজে'র ব্যবস্থাও ছিল।

১৮১৭ সালে পাঠ্যপুস্তক লেখার জন্য তিনি "স্কুল বুক সোসাইটি" প্রতিষ্ঠা করেন এবং সোসাইটি প্রকাশিত বইগুলো যাতে বিদ্যালয়ে ও সমাজে প্রচার পায় তার ব্যবস্থাও করেন। এই প্রতিষ্ঠানটির তিনি অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন ও ডেভিড হেয়ারের সহযোগিতায় এদেশে মাতৃভাষা শিক্ষায় পথ প্রসারিত করেন। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকে তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিধায়িকা বইটি প্রকাশে সাহায্য করেন, যার মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং এই ধরনের শিক্ষা যে হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত তা ব্যাখ্যা করা হয়। ১৮১৮ সালে তিনি ইংরাজী রীতি অনুযায়ী প্রথম বাংলা "নীতিকথা" ও "বাঙ্গালা শিক্ষা" নামে বাঙ্গলা বানানের বই লিখেছেন। অনেক পাঠ্যপুস্তকের জন্য আদর্শ এই বইখানি ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে অনেক প্রশংসা পায়। পারস্য ভাষায় "হেকমতে আশশীর" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন এবং

রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠান। এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটির সহসভাপতি হিসেবে তিনি সমিতির উদ্দেশ্য প্রচারের অনেক চেষ্টা করেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলি সমিতির ট্র্যানজ্যাকশনস্ সংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়। এই সোসাইটির সহসভাপতি থাকাকালীন তিনি ২৪ পরগণা জেলার কৃষিব উন্নতি বিধানের জন্য সযত্ন প্রয়াস এবং বিভিন্ন কৃষিকর্মের ওপর বিস্তৃত রিপোর্ট তৈরী করেন এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখেন।



প্রেসিডেন্সী কলেজের কলা বিভাগের গ্রন্থাগারে এই পাথরের ফলকটি আছে

রাজা রাধাকান্ত দেবের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ এবং শিক্ষা প্রসারে সহায়তা করার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে সম্মান দেওয়া হয়। ইংল্যান্ডের 'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি', প্যারি শহরের 'এশিয়াটিক সোসাইটি', কোপেনহেগেনের 'রয়্যাল সোসাইটি', জার্মানির 'ওরিয়েন্টাল সোসাইটি', সেন্টপিটাসর্বাগ নগরের 'ইম্পিরিয়াল অ্যাকাডেমি', বার্লিনের 'রয়্যাল অ্যাকাডেমি' প্রভৃতি তাঁকে অবৈতনিক সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করে। রাশিয়ার সম্রাট ও ডেনমার্কের রাজা তাঁকে পদক পাঠান, রানী ভিক্টোরিয়া রাধাকান্তকে 'নাইট' শ্রেণীভুক্ত করে 'স্যার' উপাধি প্রদান করেন। 'রাজা বাহাদুর' উপাধি তিনি আগেই পেয়েছিলেন। ১৮৩৭ সালে তাঁর পিতার মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে ঐ উপাধি দেওয়া হয়। ১৮৫১ সালে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা হবার সময় থেকে তিনি তাঁর সভাপতি নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু ঐ পদে ছিলেন।

সাহিত্য ছাড়াও তিনি সে যুগের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিতেন; দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক সব আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। দেশ ও বিদেশের অনেক যোগ্য প্রার্থীদের তিনি সাহায্য করতেন। ১৮৫৫ সালে যে দুজন ভারতীয়কে জাস্টিস অব দি পিস এবং কলকাতার অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়, রাধাকান্ত দেব তাঁদের অন্যতম এবং তিনি অনেকদিন পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন।

মহারাজা নবকৃষ্ণ তাঁর থাকার জন্য যে বিশাল প্রাসাদ তৈরী করান তারই সংলগ্ন দেড় বিঘা জায়গায় একটি পুকুর ছিল। রাধাকান্ত ঐ পুকুরের ধারে উনবিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে একটি সুন্দর এবং বিশাল থামওলা নাটমন্দির নির্মান করান, যার পাশেই থাকে নবরত্ন মন্দির আর সামনে রাস্তার দিকে ফুলের বাগান, নাটমন্দির আর বাগানের কথা আগেই বিশদভাবে বলা হয়েছে। মূল রাজবাড়ি ও এই নাটমন্দিরে অনেক সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সমাবেশের আয়োজন হত যার বেশীর ভাগেরই ঐতিহাসিক গুরুত্ব থেকে গেছে। ১৮৩৫ সাল নাগাদ যখন কলকাতায় শ্যামবাজারের নবীন বসুর বাড়িতে থিয়েটার শুরু হয়ে বেশিদিন চললনা, তখন কলকাতার বাবুরা কিছুদিন আর ঐ নিয়ে মাতামাতি করেননি। শুধু শোভাবাজারে রাজা রাধাকান্ত তাঁর বাড়ির নাটমন্দিরে স্টেজ সাজিয়ে ইংরেজী নাটকের আসর বসিয়েছিলেন (দেশ-বিনোদন, ১৯৮৯)। ২৬শে আগস্ট, ১৮৬১ সালে রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে আট হাজার ভারতীয় নাগরিক এই বাড়িতে জমায়েত হয়েছিলেন এক ইংরেজ বিচারককে অপসারণ করার প্রস্তাব আনার জন্য। দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'নীলদর্পনে'র ইংরেজী অনুবাদক রেভারেন্ড জেমস্ লং-এর বিচারের সময়ে সুপ্রিম কোর্টের ঐ বিচারপতির মন্তব্যকে কেন্দ্র করে এই বিক্ষোভ

প্রকাশ করা হয়। এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাধাকান্ত লিখিত আবেদনপত্র বিশ হাজার নাগরিকের সই-সমেত ইংল্যান্ডে সঠিক লোকের কাছে পাঠানো হয়। এই আবেদনের ফলস্বরূপ সেক্রেটারি অব স্টেট স্যার চার্লস উড ১৮৬২ সালে ঐ বিচারককে তাঁর অসংযত উক্তির জন্য সাবধান করেন এবং নীলকরদের অন্যান্য আইন বিধিবদ্ধ করতে অসম্মতি জানান।

১৮৬৪ সালে ৮৪ বছর বয়সে কাজের জীবন থেকে অবসর নিয়ে ভগবৎ চিন্তার উদ্দেশ্যে রাধাকান্ত তাঁর সুখচর বাগানবাড়ি থেকে নৌকা করে বৃন্দাবন ধামে চলে যান। কিন্তু ১৮৬৬-তে রাজাকে 'নাইট কম্যান্ডার অব দি স্টার অব ইন্ডিয়া' খেতাব দেবার জন্য আগ্রায় যে মহাদরবারের আয়োজন করা হয়, সেখানে ভাইসরয়ের অনুরোধে তিনি উপস্থিত হন। তাঁকে নাইটের প্রতীক চিহ্ন, ২১টি পর্চার খেলাৎ, একটি হাতী ও একটি ঘোড়া উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়[১২]। তিনি সভায় প্রবেশ করলে ভাইসরয় এবং অন্যান্য অতিথিবর্গ আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে সম্মান দেখান। জানা যায় যে রাজা প্রথমে সেই সম্মান গ্রহণের জন্য আগ্রায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেননি, পরে গভর্ণর জেনারেলের তরফে ব্যক্তিগত চিঠি লেখার পর পন্ডিতবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি রাজী হন।

শোভাবাজারে তাঁর বাড়ির উৎসব অনুষ্ঠানে একদিকে যেমন গভর্ণর জেনারেলসহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা উপস্থিত থাকতেন, তেমনি সাধারণ লোকেদেরও অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। রাজার গুণমুগ্ধ লোকেরা চাঁদার টাকায় তাঁর একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি আঁকান, যে তৈলচিত্রটি এসিয়াটিক সোসাইটির হলঘরে টাঙানো আছে। রাধাকান্তকে কলকাতার হিন্দুসমাজ তাদের নেতা বলে মেনে নেয় এবং তাঁকে শ্রেষ্ঠ হিন্দুর মর্যাদা দেওয়া হোত। ১৮৬৭ সালের ১৯শে এপ্রিল তিনি তাঁর বৃন্দাবনের আশ্রমে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মারা যাবার আগেই তিনি তাঁর শেষকৃত্যের পূর্ণ নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং শ্রাদ্ধের কাজকর্ম বিষয়ে বলে দেন। তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে বিশাল শোকসভায় তিনটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় - একটি প্রস্তর মূর্তি স্থাপন, একটি তৈলচিত্র অঙ্কন এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে প্রতি বছর একটি সোনার মেডেল দেবার ব্যবস্থা থাকবে। এই প্রকল্পে বড়লাট বাহাদুর থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সবাই চাঁদা দেয়। মূর্তিটা এখন টাউন হলের একটি কুলুঙ্গিতে রাখা আছে, প্রতিকৃতিটি আছে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের হলঘরে আর পদক সংস্কৃত কলেজের শ্রেষ্ঠ স্নাতক ছাত্রকে দেওয়া হয়।

উত্তর কলকাতার আপার চিৎপুর রোড (রবীন্দ্র সরণি) ও মদনমোহন তলার

কাছে রাধাকান্তের নামে পাঁচটি রাস্তা ছিল। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকে মদনমোহনতলা স্ট্রিট তৈরী করার সময়ে অনেক কিছু পাল্টে যায়, বর্তমানে কেবল রাজা রাধাকান্ত দেব লেন আছে। রাধাকান্তের তিন পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ, রাজেন্দ্রনারায়ণ এবং দেবেন্দ্রনারায়ণ। (পুরো বংশতালিকা পরে দেওয়া হয়েছে।) মধ্যম পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণকে সরকার 'রাজা' পদবী ও মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করেন। রাধাকান্ত দেবের শেষ 'উইলটি' একটু বিশেষ ধরনের। তিনি তাঁর তিন ছেলেকেই সমস্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখেন; দু'জন জামাইকেও বাদ দিয়ে, আনন্দকৃষ্ণ বোস ও শ্যামলাল মিত্র নামে দুই নাতির হাতে সব ভার তুলে দেন। গৃহদেবতা শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউ এর নামে দেবোত্তর সম্পত্তির ট্রাস্টি করেন, যাতে বলা থাকে ঠাকুরের দেখাশোনা করে যা অবশিষ্ট থাকবে তাই তিন ছেলের মধ্যে সমান ভাগ হবে। সেই অনুযায়ী এই এস্টেটের কর্তৃত্ব প্রতি বছর পাল্টে গিয়ে বংশধরদের পুরুষ বা মহিলাদের ওপর ন্যস্ত হয়। যে বছর যাঁর 'পালা' পড়ে, তাঁর ওপরই দুর্গাপূজোর দায়িত্বও থাকে এবং বলতে গেলে তিনিই তখন 'রাজা' বা 'রানী'; যদিও প্রতি বছরই পূজো একই ধাঁচে পুরানো রীতি-নাতি মেনেই হয়। আমি একটা জিনিষ জানতে পেরে খুব খুশী হয়েছি যে রাধাকান্ত তাঁর নিজের জীবদ্দশাতে ঐ বাড়ির দুর্গাপূজোর সময়ে পশুবলি বন্ধ করেছিলেন এবং সেই ধারা এখনও চলে আসছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের এ বাড়িতে এখনও সেই বলি চলেছে, দু'একজন বিশেষ করে অনাথকৃষ্ণ বলি বন্ধের চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি। সম্প্রতি আমি এ ব্যাপারে একটু উদ্যোগ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধাক্কা খেয়েছি। তবে এটাও দুঃখের সঙ্গে জানাই যে এস্টেট রাধাকান্ত দেবের অন্যান্য বিষয়ের বর্তমান অবস্থা বেশ খারাপই বলা চলে। কারণ ঠাকুরদালান সংলগ্ন বাড়ি, নাটমন্দির ইত্যাদির একেবারেই ভগ্নদশা। এই বাড়ির শরিকরা অনেকেই এখানে থাকেন না, বছরে একবার পূজোর সময়ে আসেন - কাজেই নিজেদের তরফ থেকে উদ্যোগ নিয়ে কিছু করার লোকের অভাব। সম্প্রতি সরকার এবং কলকাতা কর্পোরেশন এই বাড়ির কিছু অংশের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য বাকীটুকু হয়ত রক্ষা পাবে।

রাজা রাধাকান্ত দেবের সুবিশাল জনহিতকর কাজকর্ম থাকা সত্ত্বেও তিনি কিছুটা বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহপ্রথা আইন করে বন্ধ করার যে প্রয়াস চালান, তিনি স্বশরীরে প্রথম ১৮২৯ সালে গভর্ণর জেনারেল বেন্টিকের কাছে লিখিত প্রতিবাদ পেশ করেন। প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হলে উদ্ভুত পরিস্থিতি আলোচনার জন্য সভা আহ্বান করেন এবং সভার পক্ষে বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আসলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে,

সতীদাহপ্রথা আইনের দ্বারা বন্ধ করলে দেশের ধর্মপ্রাণ মহিলারা ক্ষুন্ন হবেন-তাই তিনি এই প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে এটা বলা যায় যে রাধাকান্তের নিজের বিশাল পরিবারে এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি।

রাধাকান্তকে নিয়ে দ্বিতীয় বিতর্কের অবতারণা হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রস্তাবিত বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে। ১৮৫৬ সালে শোভাবাজার রাজবাড়িতে এই প্রস্তাবের সমর্থক ও বিরোধী পণ্ডিতদের আলোচনা সভা হয়। পণ্ডিত ভবশংকর বিদ্যারত্ন বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থন করে অপর এক প্রসিদ্ধ বিরোধী পক্ষ সমর্থনকারী পণ্ডিতের বিরুদ্ধে জয়ী হন এবং শাস্ত্রজ্ঞ রাধাকান্ত দেব ভবশংকরকে এক জোড়া শাল দিয়ে পুরস্কৃত করেন। বিধবা তথা নারীজাতিকে সুশিক্ষা দিয়ে স্বাবলম্বী করার জন্য গ্রামে গ্রামে স্কুল খোলার উদ্দেশ্যে রাধাকান্ত পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে একলক্ষ টাকা অর্থ দানের প্রস্তাব করেন। তাঁর মতে সুশিক্ষিত ও স্বাবলম্বী বিধবারা নিজেরাই এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে আর তাতেই এই সমস্যার সমাধান হবে। ১৭ই মার্চ, ১৮৫৬ সালে রাধাকান্ত বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে ৩৬,৭৩৬ জনের সই সমেত অবেদনপত্র ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন। ত্রিবেনী, ভাটপাড়া, নদীয়া, বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি জায়গা থেকেও সবশুদ্ধ প্রায় চল্লিশটি আবেদন পত্রে ৫০/৬০ হাজার লোক প্রস্তাবিত আইনের বিরোধিতা করেন। ঐ বছরই ২৬শে জুলাই বড়লাট আইনটি পাশ করেন। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, রাধাকান্ত আইনের সাহায্যে বলপূর্বক এই সব কাজের সক্রিয় বিরোধীর ভূমিকায় থাকলেও, তাঁর সুচিন্তিত মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলেই মনে হয়। সমাজসংস্কার এবং সংস্কৃতির প্রসার বিষয়ে রাধাকান্ত সে যুগে যতদূর এগোতে পেরেছিলেন সেইটুকুর জন্যই তিনি সমস্ত দেশবাসীর কাছে কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য।

দুই

রাজা রাজকৃষ্ণ দেব

মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের একমাত্র পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণের জন্ম হয় ১৭৮২ সালে। আগেই ঐ কথা বলা হয়েছে যে তাঁর মেয়ে হলেও অনেকদিন পর্যন্ত ছেলে না হওয়ার জন্য নবকৃষ্ণ তাঁর ভাই রামসুন্দরের ছেলে গোপীমোহনকে দত্তক নেন। এই ছেলে পাবার আশায় তিনি নাকি একের পর এক ছয়/সাতবার বিয়ে করেছেন বলে জানা



রাজা রাজকৃষ্ণ (১৭৮২-১৮২৩)

যায়। দত্তক নেওয়ার প্রায় ১৬/১৮ বছর পর মেমারি নিবাসী রামকানাই (বসু) মল্লিকের কন্যা নবকৃষ্ণের চতুর্থ স্ত্রী সুখী দাসীর গর্ভে এই রাজকৃষ্ণের জন্ম হয়। এতদিন পরে নিজের ছেলে হওয়াতে মহারাজা খুশী হয়ে নাগরিক তালুক এবং মফস্বলের জমিদারীর প্রজাদের বাকি খাজনা মকুব করে দেন। গরিবদের অনেক

টাকাপয়সা ও খাবার জিনিস এবং ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের দানধ্যান করেছিলেন। আগেই জানিয়েছি রাজকৃষ্ণ জন্মাবার পরে নবকৃষ্ণ পুরানো বাড়ির উল্টোদিকে নতুন বাড়ি, ঠাকুরদালান ইত্যাদি তৈরী করান এবং তাঁর শিশু পুত্র ও তার মাকে নিয়ে নতুন বাড়িতে চলে আসেন। সেই সঙ্গে তাঁর গৃহদেবতা শ্রীশ্রী গোপীনাথ রাধারাণীকেও নিয়ে এসে নতুন ঠাকুরদালানে প্রতিষ্ঠা করেন। পরে প্রয়োজনমত পাশাপাশি জমিতে বাড়ি বাড়িয়ে নেন। যদিও নতুন ঠাকুরবাড়ি তিনিই তৈরী করাতে শুরু করেন, নবকৃষ্ণ মারা যাবার আগে তা শেষ হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর রাজকৃষ্ণ খানিকটা পাল্টে ফেলে বাড়িটা নতুন করে তৈরী করান। পুরানো আর নতুন বাড়ি, মোটামুটিভাবে বড় তরফ আর ছোট তরফ এই হিসেবে ধরা হয়।

মাত্র ১৫ বছর বয়সে রাজকৃষ্ণ পিতাকে হারান। বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে তিনি একেবারে চরম বিলাসিতার মধ্যে জীবনযাত্রা শুরু করেন। তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ ও একজন দক্ষ অশ্বারোহী ছিলেন। তিনি বাঙ্গলা, হিন্দী ও ফারসী ভাষায় পটু এবং সেই সময়েব সঙ্গীতের সাধনা ও সংস্কৃত শিক্ষার একজন বড় পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। তাঁর দান ও উদারতাও ছিল অসীম। কাস্টমস হাউস ও কতকগুলি থানা তৈরী করার জন্য সরকারকে জমি দিয়েছিলেন। বি.টি.রোড নির্মানের জন্য তিন মাইল বিস্তৃত জমি দান করেন, বিভিন্ন জায়গায় ১০০টি পুকুর এবং খড়দহ থেকে নাটাগড় (সোদপুর) পর্যন্ত একটা খাল কাটিয়েছিলেন। বাঙ্গলা, হিন্দী ও ফারসী এই তিনটি ভাষার উপর তার দখল ছিল এবং তিন ভাষাতেই তিনখানা বই লিখেছিলেন।

১৭৯১ সালে রাজকৃষ্ণের বিয়ের উৎসব সেই সময়ের একটি স্মরণীয় ঘটনা। বরযাত্রী হিসেবে সেদিন বিশিষ্ট রাজপুরুষেরা ও মাননীয় লোকজন শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ থেকে চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এই শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। বাকি ধুমধাম সব সেই অনুপাতেই সম্পন্ন হয়েছিল। গান-বাজনার প্রতি রাজকৃষ্ণের গভীর আকর্ষণ ছিল। তিনি নিজে একজন ভাল গায়ক এবং বাদ্যযন্ত্র বাদক ছিলেন। মহারাজার আমলে যেমন কবিগান, পাঁচালি, কথকতা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, রাজার আমলে তেমনি হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটকী উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রসার হয়। তাঁর আমলে উত্তরপশ্চিম ও দাক্ষিণাত্যের বড় বড় ওস্তাদ এসে রাজার কাছে পুরস্কৃত হয়েছেন এবং প্রশংসাও পেয়েছেন। আসলে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তিনি একজন সমঝদার লোক ছিলেন।

রাজকৃষ্ণের চালচলন ও পোশাকআশাকেও মুসলমানি ধরন ছিল, আর বেশির ভাগ সময়ে তিনি মুসলমান গাইয়েবাজিয়ে ও বাইজীদের নিয়ে সময় কাটাতেন [৭]। মুসলমান ও হিন্দু দুই গোষ্ঠীর উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন বলে জানা যায়। এই



মহারাজা শিবকৃষ্ণ (১৮০৪-১৮৬৬)

ব্যাপারে একটা মজার গল্পও শোনা যায় - একবার কোন হিন্দু উৎসবে রাজা রাজকৃষ্ণকে মিছিলের সঙ্গে যেতে দেখে দ্বারকানাথ ঠাকুর, যিনি রাজকৃষ্ণের চেয়ে ১২ বছরের ছোট ছিলেন, ঠাট্টা করে বলেন, "রাজা, আপনি ত দেখছি হিন্দুদের সঙ্গে হিন্দু আবার মুসলমানদের সঙ্গে মুসলমান!" রাজকৃষ্ণ তাঁর উত্তরে বলেন : "ঠাকুর, আমি নয় দুই-ই, তুমিত একটাও নও"। ঠাকুর পরিবার পিরালী বামুন ছিলেন বলে রাজার জবাবে সেই ইঙ্গিত ছিল। মাত্র ৪২ বছর বয়সে ১৮২৪ সালের আগস্ট মাসে রাজকৃষ্ণ মারা যান। প্রবাদ আছে যে তিনি তাঁর মুসলিম রক্ষিতার ধর্মচর্চার সুবিধের জন্য শোভাবাজারেই একটি মসজিদ তৈরী করিয়ে দেন, বর্তমান মসজিদটি হয়ত তারই সাক্ষ্য বহন করছে। আরও শোনা যায় যে সৌখীন রাজা রাজকৃষ্ণের পোশাক-পরিচ্ছদ ফরমায়েস মত তৈরী করানোর জন্য শোভাবাজারের কাছেই কিছু দক্ষ কারিগরদের আনা হয়, যারা পরবর্তীকালে আরও বেশী পরিমাণে দেবেদের প্রয়োজন মেটাতে স্থায়ী বসতি করে এবং ঐ অঞ্চলের নাম হয়ে যায় দর্জিপাড়া-যতীন্দ্রমোহন এ্যাভিনিউর পূব দিকের কিছুটা জায়গা।



রাজা যাদবকৃষ্ণ (১৮২৩-১৮৫২)

রাজা রাজকৃষ্ণের পুত্রের সংখ্যা ছিল আটজন: যথাক্রমে নামগুলি হচ্ছে - শিবকৃষ্ণ, কালীকৃষ্ণ, দেবীকৃষ্ণ, অপূর্বকৃষ্ণ, মাধবকৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ,


রাজা কালীকৃষ্ণ (১৮০৮-১৮৭৪)

নরেন্দ্রকৃষ্ণ এবং যাদবেন্দ্রকৃষ্ণ (পরিশেষে বংশতালিকা দ্রষ্টব্য)। সব পুত্রদের ছবিও যথাস্থানে সংযোজিত করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে তিনজন মহারাজা ও পাঁচজন রাজা উপাধি পান, আর মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ পেয়েছিলেন নাইট উপাধি। রাজকৃষ্ণ মারা যাবার অনেক পরে রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট নামে রাস্তা হয়, যেটি অরবিন্দ সরণির দক্ষিণে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড এবং বিধান সরণিকে যুক্ত করেছে। ঠিক কোন সময় এই রাস্তাটির নামকরণ হয় তা বলা যায় না, মনে হয় ১৮৫০ সালের কিছু আগে এই নাম দেওয়া হয়েছে। তাঁর চালচলন নিয়ে সেকালে পত্রপত্রিকায় নাম উল্লেখ না করে কটাক্ষ করা হত। একবার এরকম একটি খবরে প্রকাশিত হয় যে কোন এক ভদ্রলোক বারো বছর ধরে নান্নিজান, সুপনজান, নিক্কি প্রভৃতি বাঈজীদের সঙ্গে খানাপিনা কোরে আবার নির্বিবাদে হিন্দুদের নগরকীর্তনে যোগদান করেছেন [৫]। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে 'ছোট তরফে'র দুর্গাপূজো আজও ৩৬ নম্বর রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের ঠাকুরবাড়িতে হয়ে চলেছে যা রাজা রাজকৃষ্ণের উত্তরাধিকারীবৃন্দের পূজো বলে চিহ্নিত করা হয়।


মহারাজা দেবীকৃষ্ণ (১৮১২-১৮৭২)

রাজা রাজকৃষ্ণের পর উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে তাঁর মেজ ছেলে রাজা কালীকৃষ্ণ দেব। এঁনার জন্ম ১৮০৮ সালে। একজন সাহিত্যানুরাগী মানুষ হিসাবে তাঁর সামাজিক পরিচিতি ছিল এবং রাধাকান্ত দেবের মৃত্যুর পর তিনিই রাজপরিবারের খ্যাতি ও মর্যাদা


রাজা অপূর্বকৃষ্ণ ১৮১৫-১৮৬৭

রক্ষা করেন। সংস্কৃত ও ইংরাজীতে ভাল দখল থাকার জন্য তিনি কয়েকটি নামকরা গ্রন্থ বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। ১৮৩৩ সালে ভারতবর্ষের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড বেন্টিংক কালীকৃষ্ণ দেবকে রাজা পদবী, সোনার মেডেল এবং সম্মানসূচক রাজকীয় পোশাক দিয়ে সম্মানিত করেন। জার্মানী ও ফরাসী দেশের সম্রাটগণ, বেলজিয়ামের রাজা, অষ্ট্রিয়ার সম্রাট এবং অযোধ্যার রাজা সংস্কৃত ভাষায় কালীকৃষ্ণের গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে সোনার মেডেল দিয়ে সম্মানিত করেন। নেপালের রাজা তাঁকে 'নাইট অব দি গুর্খা ষ্টার' খেতাবে ভূষিত করেন[১২]। তিনি গ্রেট ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড এবং ফ্রান্সের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্র-সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, কলকাতা শহরের জাষ্টিস অব দি পীস, মেয়ো নেটিভ হাসপাতালের গভর্ণর, বেথুন স্কুলের ম্যানেজার ও সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার তিনি সভাপতি ছিলেন। ১৮৭৪ সালের ১১ই এপ্রিল তিন পুত্র রেখে ৬৬ বছর বয়সে বৃন্দাবনধামে তাঁর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রকাননে (বিডন স্কোয়ার) তাঁর একটি বড় আকারের পাথরের মূর্তি বসানো আছে। এ ছাড়া কালীকৃষ্ণ ফাস্ট লেন ও কালীকৃষ্ণ সেকেন্ড লেন নামে দুটি ছোট রাস্তা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট ও অরবিন্দ সরণিকে যুক্ত করেছে।


রাজা কমলকৃষ্ণ ১৮২০-১৮৮৫

এই মেজরাজা বংশের সপ্তম পুরুষ অলককৃষ্ণের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি, কারণ তারই উৎসাহে ও উদ্যোগে বর্তমানে আমাদের ঠাকুরের নিত্যসেবা কমিটির কাজ চালু

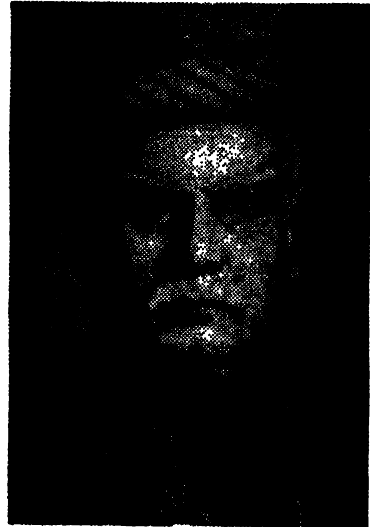
রয়েছে এবং আরও কয়েকজন বাড়ির লোকেদের সাহায্য নিয়ে বাৎসরিক দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হচ্ছে।

এর পর রাজাদের মধ্যে মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের নামই করব, যিনি দেববংশের একজন প্রতিষ্ঠিত পুরুষ ছিলেন। ১৮৯৩ সালে বিলাতের সুবিখ্যাত ম্যাকমিলন কর্তৃক প্রকাশিত 'The Golden Book of India' নামের মূল্যবান গ্রন্থে মহারাজার বিষয়ে কিছু লেখা পাওয়া গেছে। * ১৮২২ সাল, ১০ই অক্টোবর তাঁর জন্ম। পড়াশোনা করেন তৎকালীন হিন্দু কলেজে এবং ১৮৪৪ থেকে ১৮৫৩, প্রায় নয় বছর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করেছিলেন। বাংলার প্রথম ছোটলাট স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে কতকগুলি বিশেষ পদের সৃষ্টি করে অভিজাত বংশের লোকেদের মধ্যে সেগুলি দিতেন। নরেন্দ্রকৃষ্ণ খুব অল্প বয়সে সেইরকম একটি পদ পেয়েছিলেন কিন্তু কয়েক বছর পর তিনি সেই পদ থেকে অব্যাহতি নেন। ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়াতে তিনি নিজেকে শিক্ষামূলক কাজে নিয়োগ করেন।



রাজা মাধবকৃষ্ণ: ১৮১৬-১৮৩৯

সামাজিক জীবনে প্রবেশ করে তিনি কলকাতার অন্যতম মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের



মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ ১৮২২-১৯০৩

* আমার সমসাময়িক ছোটরাজার বাড়ির ধ্রুবেন্দ্রকৃষ্ণের কাছে এই তথ্য পেয়েছি।

ফেলো, মেয়ো হাসপাতালের গভর্ণর এবং চব্বিশ পরগণা জেলা বোর্ডের সদস্য পদে নিযুক্ত হন। বিভিন্ন সময়ে তিনি ছিলেন 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' এর সহ-সভাপতি, ইম্পিরিয়াল (বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থগার) লাইব্রেরির সভাপতি, কলিকাতা শহরের শান্তিরক্ষক (Justice of the peace) বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং 'বঙ্গীয় কায়স্থ সভা'র প্রথম সভাপতি ইত্যাদি। গানবাজনা প্রিয় মহারাজা 'ভারতীয় সংগীত সমাজের'ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। গভর্ণর জেনারেলের আইন সভার মনোনীত সদস্য হন ১৮৭৫ সালে। 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস' চাকরীতে ভারতীয়দের সমতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন হয়, তাকে সমর্থন করে ২৪শে মার্চ, ১৮৭৭ সালে টাউন হলের সভায় তিনি জোরালো মত প্রকাশ করেন।

১৮৭৫ সালে নরেন্দ্রকৃষ্ণকে 'রাজা' উপাধি দেওয়া হয়। ১৮৭৭ সাল, ১লা জানুয়ারিতে দিল্লীতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অভিষেক উপলক্ষে যে দরবার ও উৎসব হয়, সেই সময় তখনকার রাজপ্রতিনিধি রাজাকে 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৮৮ সালে তাঁকে নাইট কম্যান্ডার অব ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়া (K.C.I.I.) এবং ১৮৯২ সালে 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি দেওয়া হয়।

২০শে মার্চ, ১৯০৩ সালে ৮০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জন পরের দিন এক শোকসভায় তাঁর সম্বন্ধে এই প্রশংসনীয় উক্তি করেন - 'সাধারণের হিতাকাংক্ষী, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণের তিনি আদর্শস্থানীয় ছিলেন'। নরেন্দ্রকৃষ্ণ 'রামায়ণের কথা ও অন্যপূর্বা বিবাহ' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর লেখা অন্য কিছু বইও এককালে জনপ্রিয় হয়েছিল।

শোভাবাজারে তাঁর নামে যে মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ পার্ক আছে তারই খানিকটা অংশে মেট্রো রেলের ষ্টেশন হয়েছে। ডায়মন্ড হারবারের কাছে হটুগঞ্জ এলাকায় নরেন্দ্রকৃষ্ণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি বর্তমান।

তিন

রাজা বিনয় কৃষ্ণ দেব বাহাদুর

শোভাবাজার দেব পরিবারের বংশে যে কয়েকজন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মহারাজা কমলকৃষ্ণের ছোট ছেলে বিনয়কৃষ্ণকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। আনুমানিক ১৯০৬ সালে বিলাত থেকে প্রকাশিত 'Cyclopedia of India' বইটিতে তাঁর নাম রয়েছে। ১৮৬৬ সালে, আগষ্ট মাসে তাঁর জন্ম। মাত্র ১৫/১৬ বছর বয়সে গরীব ছাত্র ও অভাবী মানুষদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তিনি শোভাবাজারে 'Benevolent Society' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। শতাধিক গরীব ছাত্র গবেষক এবং বিধবাদের তিনি সাহায্য করতেন।

মিঃ হিউমের সঙ্গে সহযোগিতা করে তিনি বেঙ্গল ন্যাশানাল লীগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং কলকাতার সোস্যাল কনফারেন্সে সভাপতি হন। ১৮৮৬ সালে কুড়ি বছর বয়সে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। শ্রীঅরবিন্দ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিনয়কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে (১৯০৫-১১) তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯০৮-০৯ সালে বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসের সহসভাপতি নির্বাচিত হন। এর আগে ১৮৯২ সালে তিনি 'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' এর সভাপতি, মেয়ো হাসপাতালের গভর্ণর এবং 'ক্যালকাটা হিস্টোরিকাল সোসাইটি'র সহসভাপতি ছিলেন। ২৩শে জুলাই, ১৮৯৩ সালে বিনয়কৃষ্ণ নিজের বাড়িতে সাহিত্যচর্চার আসর 'বেঙ্গল এ্যাকাডেমী অফ লিটারেচার' প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরের বছর ১৮৯৪ সাল থেকে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' নামে পরিচিত হয়। প্রসঙ্গত জানাই, বিনয়কৃষ্ণের ব্যক্তিগত সংগ্রহের সব বই বর্তমান 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' লাইব্রেরিতে তাঁর নামাংকিত আলমারীতে যত্ন সহকারে রাখা হয়েছে। সাহিত্য সভা নামে প্রতিষ্ঠানটিও বিনয়কৃষ্ণের যত্নে ও অর্থানুকুল্যে তাঁরই বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর নিজের লেখা কয়েকখানি বইয়ের মধ্যে ' The Early History and Growth of Calcutta ' বইখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বইটি অবলম্বন করে পরে ১৯৮৯ সালে শ্রী সুবল চন্দ্র মিত্র 'কলিকাতার ইতিহাস' নামে বাঙ্গলায় একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

মহারাজা কমলকৃষ্ণ ও পরে রাজা বিনয়কৃষ্ণের সহায়তায় 'অমৃতবাজার পত্রিকা' কাগজটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১৮৯০ সালে দৈনিক হিসেবে রূপান্তরিত হয়। এ ছাড়া প্রভাবশালী ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা 'বেঙ্গলি' বিনয়কৃষ্ণের ঐকান্তিক চেষ্টায় প্রকাশিত হয়। বিলাতে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়া' পত্রিকাকেও তিনি আর্থিক সাহায্য ও উৎসাহ দিয়েছেন, যে কাজে তিনি ডাব্লু.সি.ব্যানার্জীর সাহায্য পেয়েছিলেন। তিনি কিছু

বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং দাতব্য চিকিৎসালয় চালিয়েছেন। বিনয়কৃষ্ণকে সরকার কলকাতা শহরের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হিসেবে মনোনীত করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার পর কলকাতায় প্রথম যে নাগরিক সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়, ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭ সালে সেই বিরাট জনসভায় রাজবাড়ির উঠোনে অনেক গন্যমান্য লোকের উপস্থিতিতে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব সভাপতিত্ব করেন। জানা যায় প্রথমে বর্ধমানের মহারাজাকে সভাপতি করে এই সভার আয়োজন করা হবে ভাবা হয়েছিল, কিন্তু স্বামীজী কালাপানি পার ক'রেছেন বলে মতপার্থক্য দেখা দেয়। তখন বিনয়কৃষ্ণ রাজী হয়ে শোভাবাজারেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করান। এই সভার উপস্থিতির তালিকা আগেই দিয়েছি। বিশিষ্ট গ্রন্থকার শঙ্করী প্রসাদ বসুর লেখা থেকে জানা গেছে যে, 'ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক নগরীতে এর থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তি সমাবেশ হয়নি।' সভাপতির ভাষণে রাজা বিনয়কৃষ্ণ স্বামীজীকে 'প্রিয় ভ্রাতা' বলে সম্বোধন করে স্বীকারোক্তি করেছিলেন - 'বিবেকানন্দের মত মানুষ কোটিকে গুটিক মেলে, নরকুলে তিনি নরেন্দ্র; বিদেশে তাঁর কর্মসাফল্য স্বদেশে জাতীয় জীবনে বেগসঞ্চার করেছে, জাতীয়তা যার ফল-পরিণতি। তিনি এসেছেন বিজয়ী বীরের মতো, তাঁকে প্রাণভরা অভিনন্দন দিই।'

জানুয়ারি, ১৯১১ সালে কলকাতায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক দরবারে নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বিনয়কৃষ্ণ ছিলেন অন্যতম। প্রথমে ১৮৯৫ সালে 'রাজা', ১৯০২ সালে 'কাইজার-ই-হিন্দ' এবং ১৯১০ সালে তিনি 'রাজা বাহাদুর' উপাধি পান। ১লা ডিসেম্বর, ১৯১২ সালে তিনি মাত্র ৪৬ বছর বয়সে মারা যান। তাঁর ৮জন ছেলে ছিলেন, যাঁদের মধ্যে প্রত্যুষকৃষ্ণ ভারতের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিলিয়ার্ড খেলোয়াড় ছিলেন। জাতীয় প্রতিযোগিতায় তিনি পর পর তিনবার চ্যাম্পিয়ন হন এবং দেশের প্রতিনিধি হিসেবে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যুষকৃষ্ণ অবিবাহিত থেকে বিদেশে মারা যান বলে জানা যায়।

এর পর যাঁদের নাম উল্লেখ করব, তাঁরা আগের তালিকার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট মাপের, আর তাঁদের কাজকর্মের সঙ্গে লোকের তেমন পরিচয় নেই। তবে এঁদের মধ্যেও কয়েকজন বিদগ্ধ মানুষ ছিলেন, যাঁরা তাঁদের প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন। এমনই একজন হচ্ছেন কালীকৃষ্ণের ছেলে রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ, যাঁর জন্ম আনুমানিক ১৮২৬ সালে। তিনি ১৮৫১ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। বিভিন্ন সময়ে তিনি 'বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল' ও 'ভাইসরয়'স কাউন্সিলের' সভ্য এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। ১৮৭৪ সালে ৪ঠা জুন 'রাজা' উপাধি

পান। হরেন্দ্রকৃষ্ণের পর দেবপরিবারে শেষ রাজা ছিলেন মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণের পুত্র রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ। ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৫০ সালে এঁনার জন্ম। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করার পর হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কলেক্টর হন। ১৮৭৬ সালে রেজিস্ট্রার অব এ্যাসুয়রেন্সেস হয়েছিলেন। তিনি বহরমপুর, ফরিদপুর এবং পাবনায় বিভিন্ন সময়ে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর ছিলেন। তিনি সিভিল ও সেসন জর্জ হিসেবে ঢাকা, নদীয়া, বর্ধমান এবং হুগলিতে কাজ করার পর ১৯০৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ২৯শে জুন, ১৯০৬ সালে তাঁকে 'রাজা' উপাধি দেওয়া হয়। 'বঙ্গীয় কায়স্থ সভার' সভাপতি থাকাকালীন স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ এবং জাস্টিস সারদাচরণ মিত্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়, আর ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি হন। ২৬শে মার্চ, ১৯৩২ সালে তিনি মারা যান। উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চলে বর্তমান সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ থেকে কম্বুলিটোলা পর্যন্ত পূব দিকের ছোট একটি রাস্তার নাম রাখা আছে রাজা গোপেন্দ্র ষ্ট্রীট। রাজা বিনয়কৃষ্ণের মত, রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণের নামও 'Cyclopedia of India' বইটিতে পাওয়া যায়।

রাজামহারাজাদের খবর বাদ দিয়ে এবার আমি বাড়ির কিছুটা সাধারণস্তরের লোকেদের নিয়ে আলোচনায় আসব। তাদেরই মধ্যে এমন একজন বিশিষ্ট লোক ছিলেন উপেন্দ্রকৃষ্ণ, রাজা অপূর্বকৃষ্ণের এক ছেলে, যিনি চলতিভাষায় ''হরিদাসের গুপ্তকথা'' বইটির লেখক। তাঁর জীবিতকালেই ১০০০ কপি করে ১১টি মুদ্রণ প্রকাশিত হয়, আর দ্বাদশ মুদ্রণ প্রকাশিত করেন ওঁনারই ছেলে অসীমকৃষ্ণ। তাঁর পুত্র হারীতকৃষ্ণ দেব একজন সাহিত্যানুরাগী বিদগ্ধ মানুষ হিসেবে শিক্ষিত সমাজে পরিচিত ছিলেন। ১৮৯৪ সালের মার্চ মাসে তাঁর জন্ম। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন। তিনি ল কলেজে বিখ্যাত লেখক প্রমথ চৌধুরীর ছাত্র ছিলেন। তাঁর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে হারীতকৃষ্ণ তাঁরই উৎসাহে 'সবুজপত্র'-এ লেখা শুরু করেন। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর যে চিঠি আদান-প্রদান হয় তার ওপর ভিত্তি করে ১৯৯৭ সালে 'সবুজ পাতার ডাক' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫৯ সালে, 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে 'সবুজ পাতার ডাক' প্রকাশিত হয়ে সাধারণ লোকের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। মূলত স্মৃতিচারণ হলেও বইটিতে আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও প্রাচীন ইতিহাস, সংগীত, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি আরও অনেক কিছু স্থান পেয়েছে। সদা হাসি-খুশী লেখকের রসবোধ গ্রন্থের মধ্যে এক সুন্দর সজীবতার আমেজ এনে দিয়েছে। একটি বিখ্যাত সাহিত্য সভার ছবি তাঁর লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে। সুরসিক ও সঙ্গীত-সমঝদার মানুষটি নিজে ভাল গান গাইতে পারতেন এবং শুনেছি অকৃতদার এই মানুষটি সারাদিন পড়াশোনার মধ্যেই

ডুবে থাকতেন। প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে মৌলিক গবেষণার কাজ করেছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ তাঁর বইতে হারীতবাবুর কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। 'খৃষ্ট-কৃষ্ণ-কৃষণ' ও 'মহাসেন হবিষ্ক' উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। ইংল্যান্ডের, জার্মানির এবং এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ১৯১৭ সালে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হন। হারীতকৃষ্ণ 'ভবতারণ সরকার' ছদ্মনামে হাসির গল্প লিখতেন। ২রা জুলাই, ১৯৬৬ সালে তিনি মারা যান। আমার খুব দুর্ভাগ্য যে ওঁনার সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পাইনি। বিশেষ করে এখন এই সংকলনটা লিখতে বসে খালি মনে হয়, উনি জীবিত থাকলে কত পুরানো দিনের গল্প এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া সম্ভব হতে পারত। সবথেকে আফশোষের কথা যে দেখাশোনার অভাবে ওঁনার নিজের বইয়ের অসাধারণ সংগ্রহটি নাকি নষ্ট হয়ে গেছে, যা রাখতে পারলে আজকের দিনে একটি বিরাট সম্পদ বাঁচানো যেত। শুনেছি হারীত জ্যাঠামশাইয়ের বৈঠকখানায় অনেক জ্ঞানিগুণী মানুষের আসা-যাওয়া ছিল। কেউ এলেই নিজের হাতে ভাল চা করে তিনি খাওয়াতে ভালবাসতেন। লখনউ থেকে কলকাতা এলেই ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর বাড়িতে আসতেন আর ভাল গান-বাজনার আসর বসত। সহপাঠীদের কাছে হারীত, কয়েকজনের কাছে হারীতবাবু, আর সকলেরই কাছে হারীতদা। এমনকি বাবা ছেলে উভয়ের কাছেই তিনি ছিলেন হারীতদা। বৈঠকী হারীতকৃষ্ণের বন্ধুভাগ্য ছিল হিংসে করার মতো। তাঁর ঘনিষ্ঠদের মধ্যে নাম করা যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, নীহার রঞ্জন রায়, নরেন্দ্র দেব, অমল হোম, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, কাজী আবদুল ওদুদ, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, কিরণশঙ্কর রায়, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, রমেশচন্দ্র সেন, কালিদাস নাগ, দেবেন্দ্রমোহন বসু, রাখাল ভট্টাচার্য, শৈবাল গুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। ইংরাজীতে একটা কথা আছে 'A man is known by the company he keeps', হারীতকৃষ্ণের সুহৃৎবর্গের কথা ভাবলে মানুষটিকে চিনতে আর কোন অসুবিধা হয় না। প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্রের সূত্রে কবিগুরুর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হবার পর থেকে হারীতকৃষ্ণ জোড়াসাঁকোতে রবিবাবুর বৈঠকখানায় প্রায়ই যেতেন।

সবুজ পত্র বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারীতকৃষ্ণের প্রত্যক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তখনকার মতো বিচ্ছেদ ঘটলেও, 'পরিচয়' এর আড্ডায় তিনি সাময়িকভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি ইতিহাসচর্চা শুরু করেন এবং পরবর্তীকালে নামকরা ইতিহাসবিদদের তালিকায় হারীতকৃষ্ণ দেবের নামও যুক্ত হয়। এ ছাড়া নাট্য

ও শিল্পসমালোচক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। হারীতকৃষ্ণ রবীন্দ্রসংগীত গাইতে ও শুনতে খুবই ভালবাসতেন, বিশেষ করে যে সব গান রাগ-প্রধান, কীর্তন বা বাউলসুরের ওপর বাঁধা। উচ্চাঙ্গ সংগীতেও তাঁর অসামান্য দখল ছিল।

'সবুজ পাতার ডাক' ধারাবাহিকভাবে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশের সাঁইত্রিশ বছর পর ১৯৯৭ সালে বই আকারে বেরিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এরকম ঘটনা বিরল দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য, এমনকি এরকম নজির আর হয়ত নেইও[১৩]।

একটু অন্য ধরনের মানুষ ছিলেন জীষ্ণেন্দ্রকৃষ্ণ, পরিচয় হিসেবে রাজা শিবকৃষ্ণের নাতি। তিনি ১৮৮৫ সালে প্রথম ভারতীয় ফুটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন, যার নাম দিয়েছিলেন "শোভাবাজার ক্লাব"। এই ক্লাবের যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন তিনি এবং অন্যজন দেবপরিবারের জামাই শ্রী নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী, যাঁকে ভারতীয় ফুটবলের জনক বলে গন্য করা হয়। আজ যেখানে ভবানীপুর গ্রাউন্ড, সেখানেই ঐ 'শোভাবাজার ক্লাবের' তাঁবু ছিল। এটাই প্রথম ভারতীয় ক্লাব যারা ১৮৮৯ সালে ইংল্যান্ডের ট্রেডস ক্লাবের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। এই ক্লাবের আমন্ত্রনে ও ব্যবস্থাপনায় অস্ট্রেলিয়া থেকে একটি ক্রিকেট দল ইডেন উদ্যানে খেলতে আসে এবং শোভাবাজার ক্লাবের কাছে হেরে যায়। নগেন্দ্রপ্রসাদ পরবর্তী কালে ইন্ডিয়ান ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেন ও ফুটবল সম্বন্ধে কয়েকটি বইও লেখেন। ১৯৭৪ সালে আই.এফ.এ, অফিসে তাঁর একটি আবক্ষ ব্রোঞ্জ মূর্তি বসানো হয়েছে। বিখ্যাত বেতারভাষ্যকার বেরী সর্বাধিকারী এই পরিবারেরই লোক।

এর পর রাজা দেবীকৃষ্ণের দুজন নাতি, অনাথকৃষ্ণ ও মন্মথকৃষ্ণের নাম করা প্রয়োজন। অনাথকৃষ্ণ একজন প্রতিভাবান মানুষ হওয়া সত্ত্বেও পরে কি করে যেন হারিয়ে গেলেন। অনাথকৃষ্ণের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যুবক বয়সে তিনি অনাথকৃষ্ণের বাড়িতে এসে অর্গ্যান/পিয়ানো বাজিয়ে গান করতেন। আমার মেজপিসিমা খুব ছোটবেলায় খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে গান গাইতে দেখেছেন ও গান শুনেছেন। অনাথকৃষ্ণ "বঙ্গের কবিতা" নামে বাঙ্গলা সাহিত্যে একটি গবেষণামূলক বই লেখেন। 'দুর্গাপূজার বলি ও জীববলি' এই নামে তিনি একটি ১১৬ পৃষ্ঠার বই লেখেন; নৃশংস বলিদান প্রথা বন্ধ করার জন্য এই বইটাই প্রথম বাঙ্গলা বই এবং সেই নিয়ে আন্দোলনও করেন। আগেই জানিয়েছি তিনি এই কাজে সফল হতে পারেননি। তাঁর লেখা আরও দুখানি বই হচ্ছে 'গয়া-তীর্থ ও বরাকর পাহাড়' এবং 'রামায়ণ-তত্ত্ব'।

মন্মথকৃষ্ণ ছিলেন ব্যারিস্টার এবং ইন্ডিয়ান সিভিল সারভিসেব সদস্য। তিনি সেসন জজ হিসেবে কাজ করেছেন। শোনা যায় যে তিনি তাঁর বাড়ির স্বত্ব আত্মীয়দের মধ্যে বিক্রী করে সেই অর্থের সাহায্যে বিলাতে গিয়ে পড়াশোনা করেন। কৃতকার্য হয়ে দেশে ফিবে তিনি আবার নিজের অংশ ফিরিযে নেন, এই কাজ প্রমাণ করে যে তাঁব নিজেব ওপর কি অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি 'জুজু' এই ছদ্মনামে 'My Autobiography' বইটি লেখেন।

হারীতকৃষ্ণ দেবের পর আমার দেখা আরেকজন সুন্দর পুরুষ ছিলেন মেজোরাজা বাড়ির জ্ঞানেন্দ্রকৃষ্ণ। মোহনবাগান ক্লাবের এই সক্রিয় সদস্য একসময়ে ** সানফ্রান্সিসকোতে অলিম্পিক ক্লাবের হয়ে অল ব্রিটিশ বনাম অল আমেরিকান ফুটবল প্রতিযোগিতায় একজন নিয়মিত ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। ৭ই এপ্রিল, ১৯১৮ সালে প্রকাশিত The Englishman পত্রিকায় তাঁর ফুটবল খেলা বিষয়ে খুব প্রশংসা করে একটি লেখা বেরিযেছিল। তিনি দেশের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় স্টার্টার হয়ে অনেক সুখ্যাতি পেয়েছেন এবং ব্রিটিশ আমলে পূর্বাঞ্চল রোটারী ক্লাবের সদস্যও ছিলেন। ঠাকুরবাড়িতে দুর্গাপূজোর সময়ে প্রতিদিন সকালে ঠিক সময়ের আগেই এই শুভ্রকান্তি চেহারার ভদ্রলোককে উপস্থিত থাকতে দেখা যেত।

মেজরাজার বাড়ির একটি ছেলে খুব অল্প দিনের মধ্যেই জীবনে দাগ কেটে যেতে পেরেছে, যার নাম অঞ্জনকৃষ্ণ দেব। জন্ম ১৯৫২ সাল এবং মৃত্যু ১৯৭১ সাল, মাত্র ১৯ বছরের মধ্যে বেশ ভাল ভাল কবিতা লিখে রাখতে পেরেছে। তার লেখা 'প্রথম প্রশ্ন করেছিলাম', 'বিদ্রোহ', 'হিসাব' প্রভৃতি একাত্তরটি কবিতার একটি সংকলন 'অঞ্জন দেবের কবিতা' নামে এম.সি. সরকার কর্তৃক অঞ্জনের মৃত্যুর পরের বছরই প্রকাশিত হয়েছে। বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় তার কয়েকটি কবিতায় সুর দিয়েছেন। সেই গানের স্বরলিপিগুলি কবিতার বইয়ের সঙ্গেই দেওয়া হয়েছে। তার পরিচিত এক সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত করছি : "অঞ্জন তার এই প্রথম কাব্যগ্রন্থ দেখে যেতে পারে নি সত্য, কিন্তু সে তার এই কাব্যের মাধ্যমে অনাগতকাল কাব্যরসিকদের মধ্যে উপস্থিত থাকবে এবং তার বৈশিষ্ট্য যে নিঃসন্দেহে আলোচনার বিষয়বস্তু হবে কাব্যগবেষকদের মধ্যে তাতে আর সন্দেহ নেই"। আরও একজন বলেছেন, "আমরা বুঝতে পারি কবিতাই ছিল তার জীবনের অন্বিষ্ট"। সে প্রায় শ'তিনেক কবিতা লিখেছিল, ছবি আঁকাতেও তার আগ্রহ ছিল।

সরাসরি দেববাড়ি থেকে একটু সরে গিয়ে দৌহিত্র বংশে মিত্তির বাড়ি, যে বাড়ির

' অলককৃষ্ণ দেবের সৌজন্যে এই তথ্য পাওয়া গেছে, উৎস লেখকের অজানা।

কথা আগেই বলা হয়েছে, তাদের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরব যাঁর নাম শ্রী নীরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র। ইদানীং কালে দেখা বিরল চেহারার এই মানুষটিকে নিতাইদা নামে নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের সকলে চিনত। রাজা রাজকৃষ্ণের সবথেকে ছোটছেলে রাজা যাদবকৃষ্ণের মেয়ে কৃষ্ণরমনীর বিয়ে হয় মিত্র বংশে এবং সেই সূত্রে বংশপরম্পরায় ঐ বাড়ির বংশধরেরা দেববাড়ির একটি অংশে থাকা শুরু করেন এবং আজও অনেকেই আছেন। ছয় ফুটের উপর লম্বা ও একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া (যখন থেকে আমি দেখেছি) মানুষটি খুব গানবাজনার ভক্ত ছিলেন এবং আজকের 'বান্ধব শংকর সমিতির' তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। এই মিত্তির বাড়ির একদিকে ঢোকার দরজা ছিল জয়পুরিয়া কলেজের ঠিক পাশে পূর্ব দিকে, আর বাড়ির পিছনের দিকের ঢোকার রাস্তা অরবিন্দ সরণিতে।

নিতাইদা নিজে ওস্তাদ আমীর খাঁর শিষ্য এবং অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলকাতার যে কোন বড় উচ্চাংগ সংগীতের আসরে নিতাই মিত্রকে সামনের সারিতে পাওয়া যেত। 'সরোদ শিক্ষা', 'সঙ্গীত সোপান', 'রাগ সংগ্রহ' প্রভৃতি কতকগুলি বই তিনি লিখেছেন। নিতাইদার উৎসাহে ও শিক্ষায় আমাদের পাড়ার বেশ কিছু লোক গানবাজনা চর্চা করত এবং দোলের সময়ে তাঁরই পরিচালনায় ঠাকুরদালানে তাঁরই রচিত দোলের গান হোত। বাড়ির সব লোকজন সেই গান শুনতে ঠাকুরবাড়িতে যেতেন। নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের রাস্তার ধারেই একতলার একটা ঘরে নিতাইদার বৈঠকখানা ছিল আর তার সামনে দিয়ে যাবার সময় সরোদ ও সেতারের সুন্দর আওয়াজ কানে আসত। তিনি ১৯৪৪ সালে ৬৭ বছর বয়সে মারা যাবার পর বহুদিন সেই অনুষ্ঠান বন্ধ ছিল, আনন্দের কথা কিছুদিন হোল আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা আবার সেটা শুরু করেছে।

এখন আবার ফিরে আসি সেই দেবপরিবারে, তবে এবার যে দু'চারজনকে নিয়ে লিখব তারা একেবারে আমার আশেপাশের লোক অর্থাৎ যাদের আমি খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি এবং যাদের মধ্যে অনেকেই এখনও জীবিত। প্রথমেই নাম করতে হয় রথীন্দ্র কৃষ্ণ দেবের, যিনি আমার রথুদা বা বড়দা এবং বাইরের জগতে ছিলেন শিক্ষক, হেড মাস্টার, কাউন্সিলর ও কমরেড রথীন দেব। আমার থেকে বছর দশেকের বড় জ্যাঠাতুতো এই দাদা, সেজরাজার বাড়ি অর্থাৎ রাজা দেবীকৃষ্ণের বংশধর, আমাদের একেবারে লাগোয়া পাশের বাড়িতে (২০ নম্বর) থাকতেন, যে বাড়িতে তখন ভেতর দিয়ে যাতায়াত করা যেত; একতলায় বা রাস্তায় নামার দরকার হোতনা। আমি স্কুলে পড়ার সময় থেকেই দেখতুম ওরা দুইভাই থাকে, বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে, রথুদাই বড়। জ্যাঠামশাই ও জ্যাঠাইমা মারা গেছলেন, ওঁদের কথা আমার মনে পড়ে না। বুদ্ধিমান রোগা চেহারার আমার এই দাদা ছিলেন অত্যন্ত

ভদ্র ও বিনয়ী মানুষ। প্রথম জীবনে দাদা বাগবাজারে অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে সামান্য কাজ করতেন আর দু'ভাইয়ের জীবন যাত্রা ছিল খুবই সাধাসিধে। কিন্তু তার ভেতরই বেশ সৌখীন লোক; ভাল গান গাইতে ও সেতার বাজাতে পারতেন। দুর্গাপূজোয় বাড়িতে থিয়েটারে অভিনয় করতেন এবং তাঁর পরিচালনা ও নির্দেশনায় নাটকও মঞ্চস্থ হয়েছিল।

কমরেড মোহিত মৈত্রের নেতৃত্বে তিনি কাগজের অফিসে ধর্মঘটে যোগ দেন এবং চাকরীটাও হারান। বলতে গেলে তারপরই ওঁনার জীবন শুরু হোল। ঐ বয়সে আবার নতুন করে ছাত্রজীবনে প্রবেশ এবং একে একে আমার নিজের দাদা (যার কথায় পরে আসব) ও আমার সঙ্গে আই.এ., বি.এ., এম.এ. এবং বি.এড. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতিমধ্যে আরও দু'চারজন লোকের সঙ্গে একজোট হয়ে বিডন স্ট্রিটের কাছে শ্রীবিদ্যানিকেতন নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যার খরচ অনেক সময়েই নিজের বাড়ির সোনা-দানা বিক্রী করা টাকায় চালাতে হোত। সেই শ্রীবিদ্যানিকেতন এখন একটি প্রতিষ্ঠিত স্কুল, দুঃখের বিষয়, চাপে পড়ে রথুদা নিজের তৈরী প্রতিষ্ঠান ছেড়ে কাছাকাছি অন্য একটা স্কুলে যোগ দেন, এবং সেই জুবিলী স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ পান। এই সময় থেকেই শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং পরবর্তী সময় নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সেক্রেটারি এবং শেষদিকে সভাপতি হয়েছিলেন। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি ভাগ হবার পর তিনি সি.পি.আই (এম) দলে আসেন এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পার্টির কাজে যুক্ত থাকেন। তেভাগা আন্দোলনের সময়ে তিনি উত্তরবঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুরে কাজ করেন।

অনেক ছাত্রকে তিনি বিনা পয়সায় পড়াতেন এবং মাঝে মধ্যে ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে কলকাতার বাইরে বেড়িয়ে আসতেন। পার্টিতে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন, প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু (তখনও মন্ত্রী হননি) ও অন্যান্য নেতাদের রথুদার বাড়িতে আসাযাওয়া করতে দেখেছি। শুধু নিজের চেষ্টায় ও মনের জোরে একেবারে সাধারণ অবস্থা থেকে বহু বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে ঐ জায়গায় রথুদা নিজেকে দাঁড় করিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য যে আমাদের পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা মোটেই এই রাজনৈতিব দলের অনুকূলে ছিলনা। ১৯৭১ সালে বাড়ির কাছেই যতীন্দ্রমোহন এ্যাভেনিউতে প্রকাশ্য দিবালোকে নকশালপন্থী কয়েকজন তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। সেই সময়ে ব্যারাকপুর থেকে রাজভবন যাবার সময় এক বাঙ্গালি মিলিটারি অফিসারের তৎপরতায় প্রাণে বেঁচে যান, যদিও তাঁকে বহুদিন হাসপাতালে শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল।

১৯৮৮ সালে রথুদা মারা যাবার পর দৈনিক কাগজে বেশ বড় করে প্রচার করা

হয়েছিল। অল বেঙ্গল টিচার্স এ্যাসোসিয়েশন ওঁর সম্মানার্থে নিউ দীঘায় তাদের নতুন হলিডে হোমটি 'কমরেড রথীন দেব মেমোরিয়াল ভবন' নাম দিয়েছে। কাগজের অফিসের সামান্য চাকরী থেকে নিজের চেষ্টায় এই জায়গায় পৌঁছানোকে আমি বিরাট উত্তরণ বলে মনে করি।

এর পর আসব আমারই নিজের দাদা প্রশান্ত দেবের কথায়। আমার থেকে বছর দুয়েকের বড় এই দাদার শরীরস্বাস্থ্য ছোটবেলা থেকেই বিশেষ ভাল নয়। নাটক-নভেল, সিনেমা-থিয়েটার, গানবাজনার দিকে বরাবরই খুব ঝোঁক। বাবা প্রাণকৃষ্ণ দেব ছিলেন উকিল মানুষ, তিনি ঠাকুমা ও কাকাদের বিরাট সংসারের দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন আর দাদাকে দেখেছি পড়াশোনার বাইরে গল্পের বইয়ের দিকে খুব আকর্ষণ। ছোটবেলায় বাড়ির একতলার ঘরে নিজেদের মধ্যে একটা ছোট লাইব্রেরি গড়ে তোলা হয়। দাদারই লেখা ছোটখাটো নাটক বাড়ির উঠোনে চৌকি পেতে স্টেজ করে দাদার পরিচালনায় আমরা অভিনয় করেছি। দাদার গানের ভাল গলা ছিল, স্কটিশ চার্চ কলেজে ছাত্র থাকার সময়ে কলেজের অনুষ্ঠানে এবং বাইরে অনেব গানের আসরে গান করত। জলসা থেকে বেশ রাত করে বাড়ি ফিরতে দেখেছি। আই.এস.সি. পাশ করার পর থেকে আস্তে আস্তে গান ও চলচ্চিত্রের আকর্ষণে নিজেকে যুক্ত করে ফেলেছিল। বেশ কিছু গান লিখে সুর দেয়, যার থেকে কিছু কিছু বেতারের আধুনিক গানের সময়ে গাওয়া হোত। এ ছাড়া চলচ্চিত্রের গীতিকাবও হয়, কিন্তু পরে গান গাওয়া ও লেখা ছেড়ে দিয়েছিল। এর পর দাদা চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করে এবং কাহিনী ও চিত্রনাট্য লেখা শুরু হয়। বিখ্যাত অভিনেতা, সুরকার ও পরিচালকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় যাঁদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস, কালী ব্যানার্জি, সুধীন দাশগুপ্ত, তরুণ মজুমদার, বিভূতি লাহা, মৃনাল সেনের নাম উল্লেখ করতে পারি। মৃনাল সেনের ছবিতেই দাদার শিক্ষানবিসি। এদিকে ফিল্ম সোসাইটির সঙ্গেও যুক্ত ছিল। প্রথম ছবি "নায়িকা সংবাদ", অগ্রদূত পরিচালিত এবং উত্তমকুমার ও অঞ্জনা ভৌমিক অভিনীত আর তার কাহিনী ও চিত্রনাট্য প্রশান্ত দেবের। সাধারণ মঞ্চে অভিনীত দাদার প্রথম নাটক "ভ্রান্তিবিলাস", সন্তোষ দত্ত পরিচালিত, এদিকে নাট্যগোষ্ঠি 'বহুরূপী দলের দেবতোষ ঘোষ, কুমার রায়, শান্তি দাস প্রভৃতির সংস্পর্শে আসে ও লেখালিখি চালায়। দাদারই লেখা কাহিনী ও চিত্রনাট্য "কখনো মেঘ" ছবিতে উত্তমকুমার ও অঞ্জনা ভৌমিকের মূল চরিত্রে অভিনয় বেশ সাফল্য নিয়ে আসে। এই সব কাজের মধ্যে দিয়ে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গেও দাদার ঘনিষ্ঠতা হয়। এর পর আরো বেশ কয়েকটি ছবির চিত্রনাট্য লিখে দাদা খুবই সুনাম অর্জন করে এবং বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিষ্টস্ এ্যাসোশিয়েশনের তরফ থেকে প্রশান্ত দেব কে সম্মানিত করা হয়।

সত্যজিত রায় তাঁর "জলসাঘর" ছবির জন্য পুরানো জমিদার বাড়ির জিনিষের প্রয়োজনে বাড়িতে দাদার কাছে আসেন। সত্যজিত বাবুর অনুরোধে দাদা, বাবার হাতির দাঁতের সংগ্রহ থেকে ছবিতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কয়েকটা জিনিষ তাঁকে দেওয়ার সূত্রে ওদের মধ্যে যোগাযোগ হয়। কৃতজ্ঞতা স্বীকারে ঐ ছবিতে আরো অনেকের সঙ্গে দাদার নামও উল্লিখিত হয়। এই প্রসঙ্গে জানাই, আরেকটি ছবি "সাহেব বিবি গোলাম" এর শুটিং এ রাজবাড়ির বিশাল ছাদের অংশ দেখানো হয় এবং ছবির শুরুতে তার উল্লেখও থাকে। তখনকার দিনে 'বাবু কালচারে' ঐ প্রশস্ত ছাদে উঠে বাবুরা ঘুড়ি এবং পায়রা ওড়াতেন, যা আমিও দেখার সুযোগ পেয়েছি। আগে আমার বাবার যে মূল্যবান সংগ্রহের কথা বলা হয়েছে, সেই সব দুষ্প্রাপ্য জিনিষ দাদা কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে দান করে দেয়। সেগুলি যত্নসহকারে আমাদের স্বর্গত পিতামাতা ও দাদার নাম সমেত ওখানকার কাঁচের আলমারীতে সাজানো আছে।

ইদানীং কালে দাদার লেখা "মিষ্টার কাকাতুয়া" নাটকটি কুমার রায়ের পরিচালনায় 'বহুরূপী' সংস্থা কর্তৃক আজও বিভিন্ন মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়ে চলেছে এবং দর্শক মহলে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। একেবারে ভিন্ন পরিবেশ থেকে সম্পূর্ন নতুন বিষয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা সত্যিই কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।পুরোপুরি মার ওপর নির্ভবশীল থাকার পর, অবিবাহিত এই মানুষটি এখন আমাদের বোনের সঙ্গে এক সংসারে জীবন যাপন কোরে আবার কিছু কিছু কাজ কোরে চলেছে এটাই আনন্দের কথা। সাধারনতঃ আমাদের বাড়ির লোকেদের অনেক ব্যাপারে মানসিক সংস্কারের জন্য বাধার সম্মুখীন হতে হয়, প্রশান্ত দেবের ক্ষেত্রেও সেটা ভাল ভাবেই দেখা গেছে।

এর পর আসব আমার ছোটকাকা নিখিলকৃষ্ণ দেবের বড় ছেলে সুকুমারের কথায়। ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে ওর জন্ম, আমরা একই বাড়িতে একান্নবর্তী পরিবারে বড় হয়েছি। আগেই জানিয়েছি আমাদের পাড়ায় ব্যাডমিন্টন খেলার একটা ভাল পরিবেশ গড়ে উঠেছিল এবং সুকুমার (ডাক নাম শম্ভু) নামকরা খেলোয়াড়দের কাছে প্রশিক্ষন পাবার সুযোগ পায় ও তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৫৭ সালে জুনিয়র বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে জাতীয় প্রতিযোগিতায় বাংলার দলে প্রতি নিধিত্ব করে। ইষ্ট ইন্ডিয়া আমন্ত্রনমূলক খোলা প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে কলকাতার ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় স্থান পায়। ১৯৬১ সালেই খেলাধুলোর সংরক্ষিত আসনে ও দক্ষিনপূর্বরেলের চাকরীতে যোগ দেয়। সেই থেকে ও দক্ষিন-পূর্ব রেল ও ভারতীয় রেলের হয়ে জাতীয় প্রতিযোগিতায় ১৯৬১ থেকে টানা ষোল -সতের বছর ধরে ১৯৭৭-৭৮ পর্যন্ত প্রতিনিধিত্ব করেছে। নিজের চেষ্টা এবং

অধ্যবসায়ের জন্য ও একজন উজ্জ্বল তারকা হতে পেরেছিল। অবশ্য একথাও অকপটে স্বীকার করতে হবে যে আমার কাকা, অর্থাৎ সুকুমারের বাবা, অফিসে সাধারন চাকরীতে থেকে ছেলেকে যথেষ্ট উৎসাহ ও সুযোগ দিয়েছিল।

কলকাতার একটি ঐতিহ্যপূর্ন ক্লাব - Young Men's Christian Association এর ধর্মতলা শাখায় সুকুমার ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত প্রশিক্ষক হিসাবে যুক্ত ছিল। ঐ সংস্থার দুজন খেলোয়াড় ইন্দ্রজিত মুখার্জি এবং আরতি নন্দী জাতীয় জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন করেছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাদের অফিসের খেলায় আমার সেজকাকার দুই ছেলে মৃগাঙ্ক ও শুভেন্দু দেব বেশ ভাল ফল করেছে। সব সময়ে দৌড়ে বেড়ানো, হাসি খুশি, জনপ্রিয় এই সুকুমারকে এখন অনেকটা চুপচাপ দেখতে আমার মন যেন সায় দিতে পারেনা।

এই আলোচনাটা শেষ করব আমার পুত্র সুমিত্রকে নিয়ে কিছুটা লিখে। ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮ সালে কলকাতাতেই ওর জন্ম। ওর জন্মাবার ঠিক এক মাসের মাথায় একেবারে হঠাৎ ওর দাদামশাই শ্রী মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আমার এই ভেবে দুঃখ হয় যে এই দুর্ঘটনা না ঘটলে সুমিত্র একটু বড় হয়ে দাদুর কাছে কত মজার মজার গল্প শুনতে পারত।

বেশ ছোট বয়স থেকেই সুমিত্র অনেক ব্যাপারে খুব সাহসের পরিচয় দিত। ওর যখন ৯ বছর বয়স, একটা সুযোগ পেয়ে আমারা তিনজনে, আমি, আমার স্ত্রী উর্মিলা আর ছেলে এক বছরের জন্য ইউরোপে থাকি। বিদেশের ঐ নতুন পরিবেশে, বিশেষ করে ঐ ঠান্ডার মধ্যে ও নিজেকে খুব সুন্দর মানিয়ে নিয়েছিল। বিদেশী ছেলেমেয়েদের মধ্যে পড়াশোনা ও কাজকর্মে তার খুবই উৎসাহ ছিল। কলকাতায় ফিরে আবার নিজের পড়াশোনায় সে মনোযোগ দেয়, কিন্তু এ্যাডভেনচারের ঝোঁক ভেতরে খুবই ছিল। একেবারে অবাক হই যখন মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করার পরই সম্পূর্ন নিজের প্রচেষ্টায় আমাদের পাড়ার আরও দুজন এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ছেলেদের নিয়ে নিজে দলনেতা হিসেবে দার্জিলিং পাহাড়ে ট্রেকিং করার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। আমি ত এরকম কাজ কখনই করিনি, তখন সুমিত্র নিজেও এব্যাপারে নতুন ছিল। খুব সাহসের সঙ্গে সব প্রতিকূল অবস্থা কে কাটিয়ে কোন রকম অঘটন না ঘটিয়ে পাহাড় থেকে ফিরে ও আমাদের সব গল্প শুনিয়েছে। এর পর অবশ্য সে একটা মাউন্টেণীয়ারিং সংস্থার কাছে শিক্ষানবিসি করে এবং বহুবার ট্রেকিং ও কিছুটা মাউন্টেনীয়ারিং করার সুযোগ পেয়েছে। এই সাহসিকতার জোরে বোধ হয় ওর ২৫ বছর বয়সে কারুর ওপর ভরসা না করে এবং আমাদেরও কার্যত পুরোটা না জানিয়ে ১৯৯৪ সালে সামান্য কিছু পুঁজি নিয়ে ও বিদেশে পাড়ি দেয়। অনেকেরই হয়ত

বিশ্বাস হবে না, কিন্তু ঘটনার পশ্চাদপট আমার ঠিকই জানা আছে যে সুমিত্র একজন বিদেশীকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা থেকে প্রথম গন্তব্যস্থল হিসেবে Bangkok এ গিয়ে উঠেছিল। আমাদের কাছে আর্থিক সাহায্য প্রায় কিছুই নেয়নি, ওর নিজের ওপর ছিল অগাধ বিশ্বাস। সেই থেকেই ও দেশের বাইরে এবং পৃথিবীর অনেক দেশ এব মধ্যে ঘুরে ফেলেছে। বিরাট পাণ্ডিত্য বা কোন কিছুতে বিশেষজ্ঞ না হয়েও কি করে অনায়াসে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ঘুরে বেড়াতে পারছে, আমার নিজের বিদেশে থাকার অভিজ্ঞতা থেকেও পুরোটা বুঝে উঠতে পারিনা। আমাদের সঙ্গে আর ওর বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগও রেখেছে, বছরখানেক আগে মাস তিনেকের জন্য কলকাতায় এসে আমাদের সকলকেই খুব আনন্দ দিয়ে গেছে। ঠাকুরের কাছে আমার প্রার্থনা ওর শরীর স্বাস্থ্য যেন ভাল থাকে, আর প্রাণের খুশীতে জীবন ভরে ওঠে। এই ত্রিশ বছর বয়সেই সুমিত্রের থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া, লাওস, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েসিয়া এবং ইওরোপের প্রায় সব প্রধান দেশগুলোয় ঘোরা হয়ে গেছে। সম্প্রতি আমেরিকা ও কানাডাতেও যেতে পেরেছে। জীবনে কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। ওর লেখার হাত বেশ ভাল, কল্পনাশক্তি এবং বর্ণনাভঙ্গীও চমৎকার, নতুন জিনিস জানা ও করার ব্যাপারে প্রচণ্ড উৎসাহ আছে। যদি কোনদিন একটু বসে লিখতে পারে, তাহলে হয়ত লেখক হিসেবে জীবনে বিরাট সাফল্য নিয়ে আসতে পারবে।

বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী কাগজে সুমিত্রর যে লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছে " Itonda ; splendour, plunder and neglect"(Telegraph, 1991), 'It's herbs all the way' (Sunday Mail, March '92), 'The Oxford Street Boys play it cool' (Telegraph, January, '92). ও নিজে ভাল ছবি তুলতে পারে, এই লেখাগুলোর সঙ্গে যে সমস্ত ছবি দেওয়া হয়েছে তা সুমিত্রর নিজের হাতেই তোলা। আধুনিক জীবনের প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলে যথেষ্ট দক্ষ। তার ফলে Computer, Internet, e-mail এসব ইতিমধ্যেই বেশ রপ্ত করে ফেলেছে এবং ওর নিজস্ব একটা hot mail ঠিকানা রয়েছে যার মাধ্যমে পৃথিবীর সব জায়গার সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ রেখে চলেছে।

আধুনিক ইংরেজী গান শুনতে ও খুব ভালবাসে। ভাল বই পড়ার অভ্যেসও আছে, ইদানীং আবার বেদের ওপর আগ্রহ হওয়াতে সুমিত্রর পছন্দমতো কয়েকটা বই আমি ওকে কলকাতা থেকে পাঠিয়েছি।

এখন পর্যন্ত যে সব বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা সবই পুরুষদের সম্বন্ধে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে রাজবাড়ির মহিলাদের বিষয়ে সেরকম কোন তথ্য আমি পাইনি। কিন্তু মনের মধ্যে তাগিদটা ছিল বলে মনে পড়ে গেল আমার এক জ্যাঠাইমার কথা।

পারিবারিক পরিচয় হচ্ছে বড়রাজার বংশে গিরীন্দ্রকৃষ্ণের বড় ছেলে ব্যোমকেশ জ্যাঠামশাইয়ের স্ত্রী, যিনি কমলা দেব বৌরাণী নামে অধিক পরিচিত, আর আমার ছেলেবেলার বন্ধু সাধনের মা হিসেবে আমার জ্যাঠাইমা। ছোটবেলা থেকেই জ্যাঠাইমাকে দেখতুম আমাদের ঠাকুরবাড়ির দোতলার এক অংশে থাকতেন এবং সব পূজোআর্চায় দালানে পুরোহিতদের কাজে সাহায্য করতেন। এ ছাড়াও জ্যাঠাইমাকে রাজবাড়ির যে কোন অনুষ্ঠানে (বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি) সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে দেখা যেত। অর্থাৎ সব মিলিয়ে পরিবারের একজন অপরিহার্য গিন্নীমা। তারপর জানতে পারি যে আমাদের বাড়ির ঐতিহ্যপূর্ণ দুর্গাপূজোর ব্যবস্থা ও নিয়মাবলীর যাবতীয় খুঁটিনাটি তিনি অতি যত্নসহকারে লিখিয়ে রেখেছেন যাতে ভবিষ্যতে কাউকে এই আয়োজন করার সময়ে কোনরকম অসুবিধে না পেতে হয়। যাঁর দূরদর্শিতায় এত প্রয়াজনীয় একটা কাজ পরিবারের মঙ্গলের জন্য হতে পেরেছে, আমার মনে হয় স্বাভাবিক কারণেই তাঁর নাম উল্লেখ করে সকলের তরফ থেকে তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানানো একটি অবশ্য কর্তব্য, বিশেষতঃ যখন আমি এই দেবপরিবারের ইতিহাস নিয়ে এই সংকলনটি তৈরী করার উদ্যোগ নিয়েছি। যে নির্ঘণ্টটি কমলা দেব বৌরাণী লিপিবদ্ধ করেছেন, তার একটি ভূমিকাও তিনি দিয়েছেন যা আমি এখানে পুরোপুরি উদ্ধৃত করছি, আর বইটির পরিশিষ্টে তালিকাটি যুক্ত হবে। এখন আমার বিনীত নিবেদন এই যে আমার আলোচনার তালিকায় হয়ত পরিবারের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম বাদ পড়ে গেছে, তার কারণ নিশ্চয় তথ্যের অভাবেই। অজ্ঞতায় সেটা ঘটেছে, ইচ্ছাকৃতভাবে নয়।

পরিশিষ্ট

শ্রীমতী কমলা দেব রচিত নির্ঘণ্টের ভূমিকা

ডিহি কলিকাতায় পঞ্জিকা নির্দেশিত অনুক্ষণভাবে দণ্ড-পল অনুযায়ী এবং একান্ত নিষ্ঠাসহকারে শ্রীশ্রী চণ্ডীর আবাহনান্তে শ্রীশ্রীদুর্গার আরাধনা এবং শাস্ত্রোল্লিখিত বিধান অনুযায়ী শোভাবাজার "দেব" পরিবারের দুর্গাপূজার আয়োজন বিগত ২৫০ বৎসরাধিক কাল সর্ব্বজনবিশ্রুত এবং কিংবদন্তী স্বরূপ।

কালের বিবর্তনে "দেব" পরিবারের এই ঐতিহ্যমণ্ডিত শারদীয়া দুর্গাপূজার পূজা প্রকরণ, নৈবেদ্য, ভোগারতি বিষয়ে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবার মত অভিজ্ঞ পূর্ব্বতন পুরোহিত, তন্ত্রধারক, অধিকারী ও কর্ম্মচারীগণের অনেকেই আজ আমাদের মধ্যে নাই। পরন্তু, শাস্ত্রোল্লিখিত নিয়ম প্রকরণ ও ব্যবস্থাদির জন্য যথাযথ কোন নির্ঘণ্ট কোথাও লিপিবদ্ধ করাও নাই। আমি বিশ্বাস করি প্রজন্ম-পরম্পরায় এই ঐতিহাসিক পূজা বৈভবে না হউক অন্ততঃ তাহার আচার ও অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য যাহাতে বজায় রাখিতে পারে—"দেব" পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষের পক্ষে তাহাই একটি সঙ্কল্প হওয়া উচিৎ।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় পুরোহিত মহাশয়কে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ঐ পূজা প্রকরণ মানিবার জন্য খুঁটিনাটি সকল জিনিসপত্র যোগানের জন্য কোন ফর্দ্দও কোথাও লিপিবদ্ধ নাই। এই ঐতিহাসিক পূজার অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকরণের কোন ক্রুটি যাহাতে না হয় সেই জন্য আমি, কমলা দেব বৌরাণী এই "দেব" পরিবারের অন্যতমা বর্ষিয়সী পুরগৃহিনী, আমার দীর্ঘদিনের সক্রিয় অভিজ্ঞতায় একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের যোগান ও ব্যবস্থার একটি ফর্দ্দ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। উদ্দেশ্য এই যে, আমার অবর্তমানেও "দেব" পরিবারের বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের নিকট ন্যূনতম হিসাবের এই নির্দেশনামা নথিবদ্ধ থাকিলে অনুষ্ঠান ও আয়োজনের জন্য মোটামুটিভাবে কোন অসুবিধা হইবে না এবং পূজারও কোন ক্রুটী হইবে না।

স্বাঃ / কমলা দেব

এস্টেট রাজারাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুর শোভাবাজার রাজ পরিবারের অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রী ঁদুর্গাপূজার ব্যবস্থা ও আয়োজনের নূন্যতম নির্ঘন্ট

কাঠামো পূজা

শ্রীশ্রীউল্টোরথের দিন, পরিবারের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী, দুর্গাপ্রতিমার কাঠামো পূজা হইয়া আসিতেছে। কাঠামো পূজার মূল বিষয় - আড়াই হাত পরিমান একটি কাঁচা বাঁশ শ্রীশ্রীঁনাবায়ণের সমক্ষে উৎসর্গ ও পূজা। এই কাঠামো পূজাটিই প্রকৃতপক্ষে শারদীয়া দুর্গা পূজার সূচনা বলিয়া গণ্য হয়। শ্রীশ্রীঁদুর্গার পূজা আরাধনার জন্য উৎসর্গীকৃত উক্ত বংশখণ্ডটি প্রতিমা নির্ম্মানের সময় অতি অবশ্যই দেবীর দক্ষিণ পদ হিসাবে ব্যবহৃত হইবে।

শোভাবাজার "দেব" পরিবারে **কাঠামো পূজার দিন কোন দক্ষিণা দেওয়ার বিধি নাই।** পরন্তু দক্ষিণান্ত করা হয় একমাত্র পূজা সমাপনান্তে।

শারদীয়া শুক্লা নবমীতেই এই দক্ষিণান্ত করা হইয়া থাকে।

কাঠামো পূজার জন্য মোটামুটিভাবে যে জিনিষগুলির জোগাড় রাখা প্রয়োজন।

১) আড়াই হাত পরিমাণ কাঁচা বংশখণ্ড
২) তিল, হরিতকী ও সিন্দুর
৩) আসন অঙ্গুরী, মধুপর্ক বাটি
৪) মধু — ১০ গ্রাম
৫) আতপ চাল - — এক কেজি
৬) চিনি — ২০০ গ্রাম
৭) মিষ্টান্ন - — ২ টাকা
৮) দধি — ১০০ গ্রাম
৯) পাঁচ কড়াই — ২৫ গ্রাম
১০) পঞ্চজবা
১১) শিবওয়ালা ডাব - ১টা
১২) ফলমূল, পান
১৩) ১টী অপরাজিতা ফুলের মালা (১০৮)
১৪) ১টী জবাফুলের মালা (পঞ্চমুখী)
১৫) ১টী বিল্বপত্রের মালা (১০৮)
১৬) কিছু পদ্মফুল
১৭) কিছু পূজার ফুল
১৮) শক্তিপূজা হেতু রক্ত চন্দন অবশ্য প্রয়োজন
১৯) শ্রীশ্রী ঁনারায়ণের অভিষেক

বোধন পূজা হইতে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠানের জন্য মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত মূল প্রয়োজনীয় এবং অবশ্য করণীয় ব্যবস্থাগুলি সম্বন্ধে অবহিত থাকিলে এবং আগাম প্রস্তুতি লইলে বৃহৎ ব্যাপারের আয়োজনে স্বস্তি ও সাহায্য হইবে।

১) উল্টোরথের দিন অথবা পুরোহিত মহাশয় নির্দেশিত দিন ও সময়ে "কাঠামো" পূজার ব্যবস্থা করা

২) যথাসময়ে মূর্ত্তি নির্ম্মাণের বরাত দেওয়া

৩) ডাকের সাজের জন্য আগাম বরাত দেওয়া

৪) চালচিত্রের কাপড়, অভ্রলাঠি ও ময়দার আঠার বন্দোবস্ত

৫) বোধন বেদী প্রস্তুত করানো

৬) কৃষ্ণা চতুর্থীর দিন বাহিরের দালানে ঠাকুর আনা ও পূর্ব্বাহ্নে পর্যাপ্ত ... নিয়োগ।

৭) নহবতের ব্যবস্থা

৮) কৃষ্ণা নবমীর দিন 'বোধন' পূজার আয়োজন

৯) ১২ জন ব্রতী দ্বারা দুর্গা নাম, বগলা জপ, মধুসূদন জপ, রামায়ণ ও চণ্ডী পাঠের* ব্যবস্থা (প্রত্যেক ব্রতীর জন্য কুশাসন, পাঠের চৌকী ও কোশাকুশির জোগাড় রাখা)

১০) শুক্লা চতুর্থীতে প্রতিমা ভিতরের দালানে তোলা ও পর্য্যাপ্ত মজদুরের ব্যবস্থা করা।

১১) ঢাকীর বন্দোবস্ত। ব্যাণ্ডের জন্য বরাত করা

১২) কুমারটুলির মাটির দ্রব্যাদি আনয়ণ

১৩) *কৃষ্ণা নবমীর দিন -

(ক) পণ্ডিত বিদায় (খ) পুরোহিত ও তন্ত্রধারক মহাশয়ের হবিষান্নের বন্দোবস্ত রৌপ্য অঙ্গুরীয়ক দক্ষিণা ইত্যাদি

১৪) মুদি ও রেশনের দোকান হইতে -

(ক) যাবতীয় পূজা/সিধা/ছিরি(শ্রী) মায় নবমীর পূজা এবং কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার জন্য প্রয়োজনীয় আতপ চাল ও ডাইল

(খ) চিনি এবং গব্য ঘৃত

(গ) প্রদীপের (মায় মহাষ্টমীর জন্য) প্রয়োজনীয় তেলের জোগাড়

(ঘ) দশকর্ম্ম ভাণ্ডার হইতে ফর্দ মত জিনিষ আনয়ন

(ঙ) "শ্রী"দং এবং নবমীর সিধার জন্য বাজার

(চ) বলিদানের বাজার

(ছ) পাঁচ কড়াই

(জ) বেনে মশল্লা

(ঝ) কাঁচা বাজার -

১৫) পূজা ও ঘটের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাব

" ফলমূলাদি

" পান

" যাবতীয় বাসন মাজার জন্য যথেষ্ট তেঁতুল

১৬) ফুল, বিল্বপত্র (পূজা/অঞ্জলির জন্য) বিল্ববৃক্ষ, কলাগাছ-পাতা, পঞ্চ-পল্লব, ফুলের মালা

১৭) প্রয়োজনীয় গঙ্গাজলের যোগান নিশ্চিত করা

১৮) (১) তিনটি ছাগ শিশু এবং তাহাদের খোরাকি

(২) বলিদানের জন্য কামারকে খবর দেওয়া ও ধরার লোকের পূর্বাহ্নেই বন্দোবস্ত করে রাখা।

১৯) ২টি নীলকণ্ঠ পাখি

২০) নৌকা ভাড়ার জন্য আগাম বরাত করা

২১) প্রয়োজনীয় বাঁশ ও দড়ির ব্যবস্থা রাখা

২২) উৎসবের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা করা

২৩) পূজার জন্য প্রযোজনীয় মিষ্টান্ন ও দধির ব্যাপারে অগ্রিম বরাত দেওয়া

২৪) মিঠাই/ভোগের বরাত করা

২৫) কর্ম্মচারীবৃন্দ এবং জমাদারকে বক্সিস/পারিশ্রমিক বাবদ বরাদ্দ রাখা

২৬) বিসর্জ্জনের পর প্রত্যুতগমনের সময়˚ কালী মন্দিরে প্রণামী

২৭) সন্ধ্যায় ঠাকুর দালানে শান্তিজল নেওয়ার পর বিজয়া সম্মেলনের জন্য সিদ্ধি ও মিষ্টি (আগাম সতরঞ্চী চাদরের বন্দোবস্ত রাখা)

বস্ত্রদান :

প্রতিবৎসর যাহা কিনিতে হইবে ঃ-

বোধনের দিন	পুরোহিত -	১
	তন্ত্রধারক -	১
সপ্তমার দিন -	চক্ষুদানের জন্য -	১
নবমীর দিন	কামারকে -	১
”	পাঁঠা ধরার জন্য -	২
	স্থায়ী কর্ম্মচারী -	১
”	গঙ্গার জল সরবরাহের জন্য ভারীকে -	১
	মোট -	৮

উত্তরীয়/চাদর

বোধনের দিন - পুরোহিতকে -	১
তন্ত্রধারককে -	১
মোট -	২

প্রয়োজনীয় বাসন/কোসন তৈজসপত্রাদির তালিকা —

(খ) বোধন পূজার প্রাক্কালে/পূর্বাহ্নে নিম্নলিখিত তৈজসপত্রাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা প্রয়োজন —

১)	বড় থালা	৮ খানি
২)	মাঝারি থালা	৭ খানি
৩)	ছোট থালা	৪ খানি
৪)	তামার বৃহৎ জামবাটি	১ টি
৫)	বড় ঘটি	১ টি
৬)	দুধের বাটি	১ টি
৭)	জলের গ্লাস	১ টি

৮)	বড় কোশাকুশি	১ জোড়া
৯)	ছোট কোশাকুশি	৮ জোড়া
১০)	ঘণ্টা (রেকাব সমেত)	১ টি
১১)	আরতি প্রদীপ	১ টি
১২)	চন্দনের বাটি	২ টি
১৩)	ছোট গরুড় আসন	১ টি
১৪)	বড় ঘড়ি ঘণ্টা	১ টি
১৫)	কর্পূর দানি	১ টি
১৬)	পাণি শঙ্খ	১ টি
১৭)	ছোট চন্দন পিঁড়ি	১ টি
১৮)	ছোট বঁটি	১ টি
১৯)	তামার মাঝারি পুষ্পপাত্র	১ টি

বাসন/কোসন — দুর্গাপূজার জন্য

ইতিপূর্ব্বে নির্দেশিত বোধন পূজার জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ কতকগুলি তৈজসপত্রাদি ছাড়াও মূল দুর্গাপূজার জন্য যে বাসনগুলিও অত্যাবশ্যকীয় —

১) বড় গরুড়াসন,

২) তামার বৃহৎ পুষ্পপাত্র,

৩) পিতলের বৃহৎ থালা,

৪) বড় পিতলের গামলা,

৫) ঘৃতের পাত্র,

৬) পিতলের দর্পণ,

৭) হোম কুণ্ড,

[বাসনগুলি সপ্তমী পূজার দিন প্রাতঃকালে অবশ্যই যথাযোগ্য মাজা ঘষা করিয়া রাখিতে হইবে।]

সবিশেষ প্রণিধান যোগ্য —

(১) সন্ধি পূজার জন্য চাল ও চিনির নৈবেদ্যের ব্যাপারে চিহ্নিত বৃহৎ থালা দুইটি কোন কারণেই অন্য প্রয়োজনে যেন ব্যবহৃত না হয়।

(২) যদি অধিকন্তু আরও বৃহৎ থালার প্রয়োজন বোধ হয় সেগুলি মহাষ্টমীর দিন বা প্রয়োজনের পূর্বাহ্নে বাহির করিয়া ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় মোতায়েম রাখিতে হইবে।

দুর্গাপূজার প্রাক্কালে নিম্নলিখিত কতকগুলি অবশ্যকরণীয় প্রস্তুতি রাখা সুষ্ঠ পরিচালনের জন্য একান্ত প্রযোজন :

(১) দেবীপক্ষের তৃতীয়া/চতুর্থীর দিন পূজারী মহাশয়কে ৪খানি আলতা পাতা, কিছু লাল সূতা ও ২টি রজত মুদ্রা দিয়া ৪টি অর্ঘ্য প্রস্তুত করাইয়া রাখিতে হইবে।

(২) ষষ্ঠীর দিন বৈকালে সিধা লইয়া কোন 'ব্রাহ্মণ শ্রী'ব বরণডালা আনিতে যাইবেন—সঙ্গে ঢাকী যাইবে।

(৩) ষষ্ঠীর রাত্রে বিল্ববরণে শ্রীর বরণ ডালা প্রয়োজন

(৪) ষষ্ঠীর দিন ঠাকুরবাড়ির কর্ম্মচারী একটি পাত্রে ৩০ গ্রাম আন্দাজ সিন্দুর গব্য ঘৃতে পিষ্ট/মিশ্রিত করিয়া ৩টি মন্ড গোলক প্রস্তুত রাখিবেন, দেবীর কপালে চিহ্নিত করার জন্য।

(৫) ষষ্ঠীর রাত্রি শেষে "নব পত্রিকা" স্নান পর্বের জন্য ২খানি পিঁড়ে, জাগ হাঁড়ি, জাগ প্রদীপ, বিঁড়ে ও ২টি দেবী ঘট প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

(৬) (ক) সপ্তমী/অষ্টমী/সন্ধি/নবমী পূজার ৪দিনই

(১) রূপার ষোড়শ,

(২) রূপার ঘড়া ৩টি ও (৩) পিলসূজা প্রদীপ ৩ জোড়া বাহির হইবে।

(খ) ১টি থালায় ৭মী/৮মী/সন্ধি/ও নবমীর তিন দিনই থাকিবে —
- ক্ষুদ্র চেলী বস্ত্র ১টি
- শাঁখা ১ জোড়া
- লাল রুলি ১ জোড়া
- লোহা ১ গাছি
- সিন্দুর এবং অর্ঘ্য

(গ) কয়েকটি ছোট রেকাবে চাল ও মিষ্টান্ন থাকিবে

(ঘ) একটি থালায় তিন দিনই দেবীগণের শাড়ী সমূহ ও দেবতাগণের ধুতি ও চাদর থাকিবে।

বোধন পূজার জন্য দশকর্ম্ম ভান্ডার হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ফর্দ —

১)	সিদ্ধি		
২)	কুশ		
৩)	তীরকাঠি	১ দফা
৪)	সাদা সুতা	২ দফা
৫)	লাল সুতা	২ দফা
৬)	ঘটের গামছা	১ টি
৭)	চাঁদ মালা	১টি
৮)	পৈতা	১০টি
৯)	পঞ্চগুড়ি	
১০)	পঞ্চরত্ন	
১১)	পঞ্চ ঔষধি	
১২)	পঞ্চ শষ্য	
১৩)	সর্বতীর্থ জল	
১৪)	ধান	২৫ গ্রাম
১৫)	যব	২৫ গ্রাম
১৬)	রাই সরিষা	২৫ গ্রাম
১৭)	মাস কলাই	২৫ গ্রাম
১৮)	হরিতকী	৫ টি
১৯)	সুপারি	৫ টি
২০)	বয়ড়া	৫ টি
২১)	আমলকী	২৫ গ্রাম
২২)	জায়ফল	২ টি
২৩)	বড় আলতা পাতা	৫ টি
২৪)	তিল	৫০ গ্রাম
২৫)	আসন অঙ্গুরী	১টি
২৬)	মধুপর্ক বাটি	১ টি
২৭)	মধু	২৫ গ্রাম
২৮)	কর্পূর	৫০ গ্রাম
২৯)	তুলা	১০০ গ্রাম
৩০)	হলুদ	২৫ গ্রাম
৩১)	শাঁখা	১ জোড়া
৩২)	লাল রুলি	১জোড়া
৩৩)	লোহা	১গাছা
৩৪)	লাল চেলি	১ খন্ড
৩৫)	সিন্দুর চুপড়ী	১ টি
৩৬)	মাথা ঘসা	”
৩৭)	পুঁতির মালা	”
৩৮)	কাঠের মালা	”
৩৯)	তিলক মাটি	”
৪০)	দর্পণ	”
৪১)	চিরুণী	”
৪২)	কাজল লতা	”
৪৩)	গন্ধ তৈল	”
৪৪)	গন্ধ্য দ্রব্য	”
৪৫)	সিন্দুর	১ প্যাকেট
৪৬)	পানের মশলা	২৫ গ্রাম
৪৭)	বড় এলাচ	৫ টি
৪৮)	বড় মোমবাতি	২ টি
৪৯)	দেশলাই	২ টি
৫০)	ধূপকাঠি	৫০ টি
৫১)	কুশাসন	৮ টি
৫২)	ধুনা	৪০০ গ্রাম
৫৩)	টিকা	১কেজি
৫৪)	গব্য ঘৃত (২টি শিশিতে)	১০০ গ্রাম

মূল দুর্গা পূজাব জন্য দশকর্ম্মের উপকবণগুলির ফর্দ্দ —
(চতুর্থী পঞ্চমীর মধ্যে অবশ্যই চাই)

১) সিন্দুব ৩০গ্রাম
২) তীব কাঠি ১ দফা
৩) সাদা সুতা ৪ দফা
৪) লাল সুতা ”
৫) চাঁদ মালা ২ দফা
৬) ঘটেব গামছা ২ টি
৭) পঞ্চগুড়ি
৮) পঞ্চরত্ন
৯) পঞ্চ ঔষধি
১০) সর্ব তীর্থ জল
১১) জন্তু দন্ত (গজদন্ত)
১২) গোলাপজল
১৩) গন্ধ দ্রব্য
১৪) তিল ২৫ গ্রাম
১৫) ধান্য ২৫ গ্রাম
১৬) যব ২৫ গ্রাম
১৭) রাইসরিষা ২৫ গ্রাম
১৮) মাস কলাই ২৫ গ্রাম
১৯) সুপারি ৫ টি
২০) হরিতকী ৫ টি
২১) হলুদ ২৫ গ্রাম
২২) কর্পূর ৫০ গ্রাম
২৩) মধু ২৫ গ্রাম
২৪) মধুপর্ক ১ টি
২৫) আসন অঙ্গুবী ১ টি
২৬) পৈতা ৫ টি
২৭) ছোট আলতা পাতা ৮ খানি
২৮) শাঁখা ৪ জোড়া
২৯) লাল রুলি ৪ জোড়া
৩০) লোহা ২ জোড়া
৩১) লাল চেলি ৪ খন্ড
৩২) সাজসমেত সিন্দুর চুপড়ী (সন্ধিপূজাদং) ১টি
৩৩) তেকাঠ
৩৪) হোম কাঠ ৩ কেজি
৩৫) বরণডালার সামগ্রী (ষষ্ঠীর দিনে প্রয়োজন)
৩৬) মঙ্গল্য ভান্ডের সামগ্রী (সুঙ্গলী ভাঁড়)
৩৭) ছোট কুলা ১ টি
৩৮) মোমবাতি (বড়) ২ টি
৩৯) ধূপকাঠি ২৫ টি
৪০) গব্যঘৃত (৬টি শিশিতে) ৩০ গ্রাম
৪১) দিয়াশালাই ১ টি

বোধন

প্রারম্ভিক ব্যবস্থাপনা ও যথোপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি যে কোন আয়োজন বা অনুষ্ঠানকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া থাকে। আপাতদৃষ্টিতে বহু ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ব্যাপারের একীকরণ নিঃসন্দেহে সংগঠক ও আয়োজকদিগের শিল্পবোধ ও ভক্তি-বিনম্র নিষ্ঠার পরিচয় বহন করিয়া থাকে।

এবম্বিধায়, "বোধন" পূজার করণীয় বিষয়গুলি নিম্নলিখিত বিভিন্ন পর্য্যায়ে নির্দেশনামা হিসাবে প্রদত্ত হইল ঃ

(ক) বোধনপূজার আনুষ্ঠানিক আয়োজনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থার প্রস্তুতি,

(খ) পূজার জন্য প্রয়োজনীয় বাসন-কোসনের তালিকা,

(গ) দশকর্ম্মের দ্রব্যাদির ফর্দ্দ,

(ঘ) আগাম খরিদ করিয়া রাখা বা বরাত করা এবং বোধনের ১৩ দিনের জন্য মোট চাল/চিনি ইত্যাদির ফর্দ্দ,

(ঙ) যথাবিধিয়ে চাল/চিনি/মিষ্টি/ফলমূলাদি দৈনিক কি ভাবে সমর্পিত হইবে,

(চ) প্রাতঃকালীন বন্দোবস্ত, এবং

(ছ) সন্ধ্যায়/রাত্রিতে পূজার জন্য,

(জ) দৈনিক ফলমূলের ফর্দ্দ।

দফাওয়ারী বিবরণ ঃ-পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থা—

(ক) দুর্গাপূজার আয়োজনের গোড়াপত্তন হইয়া থাকে কৃষ্ণ নবমীর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বোধনের আয়োজনের মাধ্যমে। "বোধন" শব্দের অর্থ জ্ঞাপক/দ্যোতক/সূচক বা জাগরিতকারী।

"বোধন"—শ্রীশ্রীঁদুর্গার আবাহন ও পূজা আয়োজনের সূচক —"বোধন"-এই অনুষ্ঠানের জ্ঞাপক।

(১) এতন্নিমিত্ত, কৃষ্ণ নবমীর প্রত্যুষে মন্দির প্রাঙ্গনে অতি অবশ্যই "নহবৎ" বাদ্যের আগামনীর সুর দেবী আবাহনের নির্ণায়ক।

(২) অলিন্দের প্রত্যেকটি খিলানে ও দ্বারে/প্রবেশ পথে "আম্রপল্লবের ঝালর" মাঙ্গলিক নিশানা থাকিবে।

(৩) প্রাঙ্গন হইতে দেব দেউলের পথে মধ্যবর্ত্তী সিঁড়ির দুই দিকে পূর্ণ ঘটের উপর সশীর্ষ ডাব রাখিতে হইবে। ডাব ও ঘটের উপর সিন্দুর দ্বারা পুতুল আঁকা থাকিবে এবং ঘটের পিছনে রক্ষিত কদলী বৃন্ত বাতাসে হিল্লোলিত হইয়া

ভক্তসাধারণ ও দর্শনার্থিগণকে সাদর অভ্যর্থনার ইঙ্গিতবহ হইবে।

(৪) বোধন গৃহের মাটির বেদীর উপর "বিল্ববৃক্ষ" রোপন করিবেন নিত্যপূজারী মহাশয়।

(৫) চাঁদমালা, ফুল-মালা, জবা ও পদ্মফুলে সজ্জিত করিয়া "তীর ঘরে" দেবী ঘট স্থাপন করিতে হইবে।

(৬) বোধন বেদীর নীচেই তামার বৃহৎ জামবাটির মত তাম্রকুন্ডটি রক্ষিত হইয়া থাকে।

(৭) বোধন বেদীর পার্শ্বেই ছোট গরুড়াসনে সর্ব্ব যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ শীলা স্থাপিত থাকিবেন।

(৮) পুরোহিত মহাশয়ের আসনের পার্শ্বে বড় থালায় তিল, হরিতকী ও মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি মোতায়েম রাখিতে হইবে, তামার বড় পুষ্পপাত্রে খুরিতে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত আতপ তন্ডুল— পূজার জন্য প্রয়োজনীয় ফুল, দুর্ব্বা, বিল্বপত্র ফুলের মালাও রাখা হইবে—দুইটি পাত্রে শ্বেত ও রক্ত চন্দন।

(৯) পুরোহিত মহাশয়ের বাম দিকে আরতির সরঞ্জাম হিসাবে পঞ্চ প্রদীপ ও চামর ইত্যাদির জোগাড় থাকিবে।

(১০) এগুলির পার্শ্বেই একটি থালায় পুরোহিত ও তন্ত্রধারক মহাশয়দ্বয়ের জন্য বস্ত্র ও উত্তরীয় এবং রজত অঙ্গুরীয়ক বারোটি (১২টি) রাখিতে হইবে।

(১১) পূজারম্ভের পূর্ব্বেই পিলসুজে মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া দিতে হইবে এবং বোধন গৃহের পূর্ব্ব দ্বারবর্ত্তী হইয়া তন্ত্রধারক মহাশয় আসন গ্রহণ করিবেন — তন্ত্র পাঠের নিমিত্ত চৌকীর উপর পুঁথি রাখা থাকিবে। উপযুক্ত সময়ে কাঁসর/ঘন্টা বাজানোর ও শঙ্খ নিনাদের জন্য কর্ম্মচারী বহাল রাখা প্রয়োজন।

(১২) সর্ব্বোপরি ধূপ ও ধুনা, চন্দনগুঁড়া ও গুগ্‌গুলের স্নিগ্ধ সুবাসে দেবস্থানমের পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করিবে।

(১৩) এই কৃষ্ণা-নবমী তিথিতেই দ্বাদশজন ব্রাহ্মণ/পন্ডিত ব্রত গ্রহণ করেন এবং শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে ব্রত সমর্পণ করেন।

উক্ত ১২জন ব্রাহ্মণের মধ্যে ৪ জন নিজেদের মধ্যে ব্যবস্থা করিয়া (ক) দুর্গা নাম জপ (খ) বগলা মন্ত্র জপ (গ) মধুসূদন মন্ত্র জপ এবং (ঘ) রামায়ণ পাঠ করেন — অবশিষ্ট ৮ জন ব্রহ্মাণ শ্রীশ্রীচন্ডী স্তোত্র পাঠ করেন

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে —

(১৪) প্রসঙ্গতঃ "দেব" পরিবারের প্রজন্ম পরম্পরায় জানিয়া রাখা ভাল যে রাজা রাজকৃষ্ণ পুত্র আট রাজার মঙ্গল কামনায় তাঁহাদের নামে সঙ্কল্প করিয়াই উক্ত আটজন ব্রাহ্মণ/ব্রতীর চন্ডীপাঠ করা শুরু হয়।

(১৫) উক্ত জপ ও পাঠের জন্য ১২টি খুরিতে চিনি ও মিষ্টান্ন দিতে হইবে। বোধনের দৈনিক সকালের নৈবেদ্যের মধ্যে একটি থালায় নিবেদিত যে ১২ ভাগে ৬০০ গ্রাম চাল ও ১২টি মিষ্ঠান্ন থাকিবে তাহা উক্ত ১২জন ব্রতীর প্রাপ্য হইবে।

বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য :-

প্রসঙ্গতঃ লিপিবদ্ধ থাক যে দুর্গাপূজার চাল ও চিনির নৈবেদ্য হইতেও "ব্রতী"গণের প্রাপ্য থাকে। সন্ধি পূজার ৬ কেজি মিঠাই ভোগ অবশ্যই ব্রতীগণের মধ্যে বিতরিত হওয়া উচিৎ।

কৃষ্ণা নবমীর বোধন পূজা ও আরতি সমাপনান্তে প্রথমত পন্ডিত বিদায় হইয়া থাকে। পন্ডিত বিদায়, প্রণামী, দক্ষিণা ও হবিষান্নের জন্য শ্রদ্ধাভরে দেয় অর্থের বরাদ্দ, আজিকার মূল্যমানে যৎ সামান্য ও অতি নগন্য হইলেও ব্রাহ্মণ/পন্ডিতগণ এই যৎকিঞ্চিৎ দান গ্রহণ করিবার জন্য দূর দূরান্ত হইতে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াও রাজ -প্রাসাদে পদধূলি দিয়া থাকেন। দাতাগণ কুণ্ঠিত হইলেও পন্ডিতগণের বচন

'ইহা রাজ সম্মান—
যদিও হয় একটি কাঞ্চন,
মোদের কাছে —
তাহাই মানি শত-লক্ষ কাঞ্চন"

(৪) বোধনের ১৩ দিনের পূজায় প্রয়োজনীয় চাল/চিনি ইত্যাদির ফর্দ্দ (আগাম খরিদ করিয়া রাখা বা বরাত করিয়া রাখা যুক্তিযুক্ত মনে হয়)

(ক)	আতপ চাল দৈনিক ১ কেজি ৩০০ গ্রাম হিসাবে	১৬ কেজি ৯০০ গ্রাম
(খ)	চিনি দৈনিক ৩০০ গ্রাম হিসাবে —	৩ কেজি ৯০০ গ্রাম
(গ)	পাঁচ কড়াই দৈনিক ১০০ গ্রাম হিসাবে	১ কেজি ৩০০ গ্রাম
(ঘ)	গব্য ঘৃত	১০০ গ্রাম
(ঙ)	মধু	২৫ গ্রাম
(চ)	প্রদীপের তৈল	৩০০ গ্রাম
(ছ)	ধূনা	৩০০ গ্রাম
(জ)	টিকা	৭০০ গ্রাম
(ঝ)	ধুপ কাঠি	৫০ টি

(৫) ১৩ দিনের পূজায় দৈনিক সকালে কি ভাবে নৈবেদ্য সমর্পিত হইবে —

(ক)	দেবীর জন্য চাল	৪০০ গ্রাম/মিষ্টান্ন আগ সন্দেশ
(খ)	দেবাদিদেব মহাদেব (শিব) চাল	১০০ গ্রাম মিষ্টান্ন গুজিয়া
(গ)	বিল্ববৃক্ষের জন্য চাল	১০০ গ্রাম মিষ্টান্ন গুজিয়া
(ঘ)	নারায়ণের জন্য চাল	১০০ গ্রাম মিষ্টান্ন গুজিয়া
(ঙ)	অন্যান্য দেব-দেবীগণের জন্য একটি থালায় ১২ ভাগে চাল	৬০০ থালায় ১২টি
(চ)	কুচা নৈবেদ্য একটি	১২টি
(ছ)	দধি	
(জ)	চিনি	১২টি খুরিতে
(ঝ)	নারিকেল ছাপা	১২টি ২ টাকা
(ঞ)	পাঁচ কড়াই	১৮টি খুরিতে
(ট)	পানের খিলি	১৮টি
(ঠ)	গব্য ঘৃত (চালে মাখার জন্য)	৫ গ্রাম
(ড)	মধু	কয়েক ফোঁটা মাত্র

(৬) বোধন পূজার ১৩দিন রাত্রি কালীন ভোগের ব্যবস্থা —

(ক) দেবীর উদ্দেশ্যে ফলের থালা ১টি

ইহাতে ১টি ডাব ও মিষ্ঠান্ন অবশ্যই থাকিবে,

(খ) অপর ১টি থালায় দুই ভাগে ফলমূল ও মিষ্ঠান্ন থাকিবে,

(গ) কুচা নৈবেদ্য ১টি,

(ঘ) ১টি বাটিতে ১/২ লীটার আন্দাজ দুগ্ধ অবশ্যই থাকিবে।

(সন্ধ্যায় নিযমিতভাবে ১৩ দিন এই দুগ্ধ আনার দায়িত্ব থাকে পুরোহিত মহাশয়েব উপর)

(৭) বোধন পূজার দৈনিক প্রাতঃকালীন ও রাত্রিকালীন নৈবেদ্য দেয় ফলমূলের আন্দাজ

কলা	৭টি
শশা	৩০০ গ্রাম
বাতাবি লেবু	১টি
পেয়ারা	২০০ গ্রাম
আখ	এক খন্ড
আপেল	২০০ গ্রাম
ন্যাসপাতি	১০০ গ্রাম
আতা	১টি
পানিফল	১০০ গ্রাম
ডাব (অবশ্যই)	১টি (১৩দিনে ১৩টি)
মেওয়া বেদানা বাদাম পেস্তা, আকরোট ইত্যাদি) -	সাধ্যমত

এইগুলির মধ্যে কয়েকরকমের ফলমূল রকমফের করিয়া প্রতিদিন খরিদ করা যাইতে পারে

মূল কথা ঃ-

এই হিসাব বা ফর্দ্দ একান্তভাবেই গড়পড়তা এবং আনুমানিক বা মোটামুটি আন্দাজের ভিত্তিতে রচিত দ্রব্যাদির পরিমান বা গুণগত মান সংশ্লিষ্ট বৎসরে আদায়ীকৃত অনুদান বা চাঁদার উপর নির্ভর করে। যাহা না হলে নয় এমন হিসাব লেখা হইল এর থেকে কমানো যায়না।

দুর্গা ষষ্ঠীর দিন

"শ্রী (ছিরি দং) সিধার ফর্দ্দ —

মুদির দোকান হইতে

১) আতপ তন্ডুল (চাল),	২ কেজি
২) ঘৃত,	৫০ গ্রাম
৩) সরিষার তৈল,	৫০ গ্রাম
৪) চিনি,	৫০ গ্রাম
৫) ময়দা,	১০০ গ্রাম
৬) মুগের ডাল,	১০০ গ্রাম
৭) মটর ডাল,	১০০ গ্রাম

বেনে মশলা

১) হলুদ,	১০ গ্রাম
২) জিরে,	১০ গ্রাম
৩) লঙ্কা,	১০ গ্রাম
৪) মরিচ,	১০ গ্রাম
৫) সরিষা,	১০ গ্রাম
৬) ধনে,	১০ গ্রাম
৭) গরম মশলা,	১০ গ্রাম
৮) তেজ পাতা,	কয়েকটি
৯) মৌরী,	৫ গ্রাম
১০) কাটা সুপারি,	৫ গ্রাম
১১) বড় এলাচ,	২টি

কাঁচা বাজার

১) আলু	২০০ গ্রাম
২) পটল	২০০ গ্রাম
৩) বেগুন	২০০ গ্রাম
৪) কুমড়ো	২০০ গ্রাম
৫) বাঁধা কপি	৩০০ গ্রাম
৬) ফুল কপি	১টি
৭) আস্ত পান	৬টি

নানাবিধ

১) মিষ্ঠান্ন,	৪টি
২) দধি,	১০০ গ্রাম
৩) লাল পাড় শাড়ী,	১টি
৪) দক্ষিণা	১টাকা (রজত মুদ্রা ছিল)।

নব পত্রিকা পূজা —

নিম্নলিখিত তৈজসপত্র ও দ্রব্যাদি ষষ্ঠীর দিন রাত্রেই একটি ঝুড়িতে গুছাইয়া রাখিতে হইবে। পূজার উপকরণ হিসাবে

১) কুশ,	
২) সিন্দুর,	
৩) তিল, হরিতকী,	
৪) মধু,	
৫) গব্য ঘৃত,	২৫ গ্রাম
৬) পঞ্চ পল্লব,	
৭) ফুল, বিল্বপত্র,	
৮) চন্দন ঘষা,	
৯) তুলা,	
১০) মোমবাতি,	
১১) দিযাশালাই,	
১২) কাটারি	
১৩) পদ্মফুল	১টি

তৈজস পত্রাদি/বাসন কোসন

পিড়া -	২টি
১) কোশাকুশি,	১ জোড়া
২) তাম্রকুন্ড,	
৩) পঞ্চপ্রদীপ,	
৪) ঘণ্টা,	
৫) পানিশঙ্খ,	
৬) ধূপকাঠি,	

৭) থালা ২টি
৮) কুশাসন
৯) কাঁসর/ঘণ্টা
১০) দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ ১টি
১১) রূপার ঘটি •১টি

এই দুইটি জিনিষেব বহন, ব্যবহার এবং প্রত্যার্পণের ব্যাপার পরিবারের যে কোন একজন হুঁশিয়ার সেবাইতের দায়িত্বে / হেফাজতে থাকিবে।

নৈবেদ্য

১) আতপ তণ্ডুল (চাল) ১ কেজি
২) চিনি, ২০০ গ্রাম
৩) সন্দেশ (আগসন্দেশ) ২ টি
৪) দধি ১০০ গ্রাম
৫) দুগ্ধ ১/২ পোয়া
৬) আস্ত ফলমূল
৭) সশীষ ডাব ১টি
৮) পান ২টি

দুর্গাষষ্ঠী হইতে দশমী পর্যন্ত ৫ দিনের যাবতীয় পূজা ও ক্রিয়া করণাদিতে প্রয়োজনীয় মোট চাল, চিনি, মিষ্টান্ন, দধি, তৈল, ডাব, ফলমূল ও তরিতরকারী ইত্যাদির সারণীবদ্ধ এবং দফাওয়ারী ফর্দ্দ/তালিকা —

ক্রমিক সংখ্যা	পূজার বিবরণ ১	আতপ চাল ২	চিনি ৩	মিষ্টান্ন সন্দেশ ৪	দধি ৫	তৈল ৬	ডাব ৮
১	৩টি সরায় দিবার জন্য	৩০০ গ্রাম	—	—	—	জাগপ্রদীপ নিয়মিত জ্বলিলে ৬০০ গ্রাম	৩ টি
২	যাবতীয় পুষ্পপাত্রের জন্য	২০০ গ্রাম	—	—	—		—
৩	যাবতীয় কুচা নৈবেদ্যের জন্য	৪০০ গ্রাম	—	—	—	—	—
৪	শ্রী (ছিরির) জন্য সামগ্রিক বিবরণ	পৃথকভাবে এই পুস্তিকায় অন্যত্র দেওয়া আছে)				৫০ গ্রাম	—
৫	দুর্গাষষ্ঠী ও সিধার জন্য	১ কিলো	৫০ গ্রাম	সন্দেশ ১ টি	৫০ গ্রাম	—	—
৬	বেল বরণের নৈবেদ্যের জন্য	৮০০ গ্রাম	—	—	—	—	—
৭	নব পত্রিকা পূজা দং (এই পূজার যোগাড়যন্ত্র বিষয়ে বিবরণ আলাদাভাবে এই পুস্তিকায় অন্যত্র দেওয়া আছে)	১ কিলো	২০০ গ্রাম	আগাসন্দেশ ২ টি	১৫০ গ্রাম এবং কিছু দুগ্ধ	—	১ টি
মোট		৩.৭০০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম		১৫০ গ্রাম	৬৫০ গ্রাম	৪ টি

ক্রমিক সংখ্যা	পূজার বিবরণ ১	আতপ চাল ২	চিনি ৩	মিষ্টান্ন সন্দেশ ৪	দধি ৫	তৈল ৬	ডাব ৮
৮	মহাসপ্তমী পূজার জন্য	১ম পূজা ২.১০০গ্রা: ২য় পূজা ২.১০০গ্রা:	১ম দফায় ৭০০ গ্রা: ২য় দফায় ৭০০ গ্রা:	আগসন্দেশ (৪পিস) ২০০গ্রাম ৪০পিস গুজিয়া ৪০০ গ্রা: ১পিস সন্দেশ ৫০ গ্রাম	১ম দফায় দেবীর জন্য ৭টি খুরিতে ৭ভাগে ১০০গ্রা: ২০০ গ্রা: ২য় দফায় দেবীর জন্য ৭টি খুরিতে ৭ভাগে ১০০ গ্রা: ২০০ গ্রা:	৭মী/৮মী ৯মী ও ১০মীর পূজার সময় প্রদীপের জন্য ১০০ গ্রাম	৩ টি
৯	মহাষ্টমী পূজার জন্য	১ম পূজা ২.১০০গ্রা: ২য় পূজা ২.১০০গ্রা:	১ম দফায় ৭০০ গ্রা: ২য় দফায় ৭০০ গ্রা:	৪পিস আগসন্দেশ ২০০ গ্রাম ৪০ পিস গুজিয়া ২০০ গ্রা: সন্দেশ ৫০ গ্রা:	১ম দফায় দেবীর জন্য ৭টি খুরিতে ৭ভাগে ১০০ গ্রা:২০০ গ্রা: ২য় দফায় দেবীর জন্য ৭টি খুরিতে ৭ভাগে ১০০ গ্রা: ২০০ গ্রা:	—	৩ টি
১০	৫১ পীঠের জন্য নৈবেদ্য (সকালে প্রয়োজন)	১ কিলো	—	৫১পিস গুজিয়া ৫০০ গ্রাম	—	—	—
১১	নব ঘটের জন্য	২০০ গ্রা:	—	৯পিস গুজিয়া ৯০ গ্রাম	—	—	—
১২	গোরোচনা সরবত্ (মালসা সরবত্)	—	১০০ গ্রাম	—	—	—	—
মোট		১৩.৩০০ গ্রা:	৩.১৫০ গ্রা:	—	১.৩৫০ গ্রা:	৭৫০ গ্রা:	১০ টি

ক্রমিক সংখ্যা	পূজার বিবরণ ১	আতপ চাল ২	চিনি ৩	মিষ্টান্ন সন্দেশ	দধি ৫	তৈল ৬	ডাব ৮
১৩	সান্ধ্য পূজার জন্য	৫কিগ্রা:	৫ কিলো	২।টি আগসন্দেশ ১টি রাজভোগ ১টি সন্দেশ ১ টি চন্দ্রপুলি ৪ টি পেঁড়া রাবড়ি (ক্ষীর) ৫০ গ্রা:	২০০ গ্রা:	১০৮ টি প্রদীপের জন্য ৪০০ গ্রাম	১০টি
১৪	মহানবমী পূজার জন্য	১ম পূজা ২.১০০গ্রা: ২য় পূজা ২.১০০গ্রা:	১ম দফায় ৭০০ গ্রা: ২য় দফায় ৭০০ গ্রা:	৪টি আগসন্দেশ ৪০ টি গুজিয়া ১টি সন্দেশ —	১ম দফায় দেবীর জন্য ৭টি খুরিতে ৭ভাগে ১০০ গ্রা:২০০ গ্রা: ২য় দফায় দেবীর জন্য ৭টি খুরিতে ৭ভাগে ১০০ গ্রা:	— ১৫০ গ্রা গ্রা:	১ টি
১৫	দুর্গা নবমীর দিন সিধার জন্য (পৃথকভাবে দেওয়া বিবরণ দ্রষ্টব্য)	৫ কিলো	—	২টি আগসন্দেশ ৩০টি গুজিয়া —	২০০ গ্রা: —	— — দ্বার কলসের জন্য ৪টি	১টি —
১৬	দশমী পূজার জন্য	২ কিলো	৫০০ গ্রা:	—	২০০ গ্রাম	১৩দিন বোধনের জন্য ৫২ টি	৩৬ টি
১৭	কনকাঞ্জলী	৫০ গ্রা:			—		
মোট		২৯.৫৫০ গ্রা:	১০.৫০ গ্রা:		২.৩৫০ গ্রা:	১.৩০০ গ্রা:	৩৬টি

কেমন করে পূজাবো তোমায় - দাও মা আমায় ব'লে

সামর্থ্যানুযায়ী কেবলমাত্র পণ্য-সামগ্রীর সংগ্রহ করাই শেষ কথা নহে তিন দিনের পূজার প্রতিটি পর্বে দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত ভোগরাগের ও বিভিন্ন উপচারের সযত্ন ও ভক্তিপূর্ণ উপস্থাপনাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এবম্বিধায় ৭মী / ৮মী / ৯মী ও ১০মী পূজার বিভিন্ন পর্বে কি ভাবে নৈবেদ্যাদি সমর্পিত হওয়া প্রয়োজন সেই সকল বিষয়ে একটি ন্যূনতম নিরিখনামা নিম্নে প্রদত্ত হইল:-

সপ্তমী / অষ্টমী ও নবমীর প্রতিদিনেই প্রাতঃকালীন পূজার আয়োজন (ক) ও (খ) এ বর্ণিত দুই (২) দফায় হইবে এবং ঐ তিন দিনই বৈকালে জল যোগ ও রাত্রে সন্ধ্যারাতির পর রাত্রিকালীন ভোগ (গ) ও (খ) এ বর্ণিত ব্যবস্থামত আয়োজন করিতে হইবে।

বিষয়	চাল ২	চিনি ৩	আগ সন্দেস ৪	মিষ্টান্ন ৫	দধি ৬	পাঁচ কড়াই ৭	ফলের থালা ৮	ডাব ৯
সপ্তমীর পূজায় প্রাতঃকালীন প্রথম দফায় নৈবেদ্যের ব্যবস্থা								
(১) দেবী দুর্গার উদ্দেশ্যে	১ কেজি	১টি খুরিতে ৫০০ গ্রাম	১টি	—	১টি খুরিতে ১০০ গ্রাম	১৮টিখুরিতে ১০০ গ্রাম	নানাবিধ ফলের নৈবেদ্য	১টি
(২) লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক, শিব, নারায়ণ ও শ্রীরামের উদ্দেশ্যে	১টি থালায় ৭ ভাগে ৭০০ গ্রাম	৭টি খুরিতে ২০০ গ্রাম	৭টি	—	৭টি খুরিতে ২০০ গ্রা:	১৮টি পানের খিলি	১টি থালায় ৭ভাগে	
(৩) সিংহ, পেচক, হংস, মুষিক, ময়ূর ও গরূড়ের উদ্দেশ্যে	১টি থালায় ৬ ভাগে ৩০০ গ্রাম	—	৬টি	—	—	—	১টি থালায় ৬ভাগে	—
(৪) অসুরের উদ্দেশ্যে	১টি থালায় ১০০ গ্রাম		১টি	—	—	—		—
(৫) ব্রহ্মাদি পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে	১টি কুচা নৈবেদ্য	— —	৫টি	— —	—			
(খ) প্রাত:কালীন দ্বিতীয় দফায় নৈবেদ্যের ব্যবস্থা	প্রথম দফার মত ১৫টি নৈবেদ্যে ২.১০০ গ্রাম	প্রথম দফার মত ৮টি চিনির নৈবেদ্য ৭০০ গ্রাম	২টি ২০টি গুজিয়া	—	২টি খুরিতে ৩০০ গ্রাম		প্রথম দফার মত	—

(গ) বৈকালিক জলযোগের ব্যবস্থা

ফলের থালা ও মিষ্টান্ন

(১) ফলের থালা-১টি বড় থালায়
(২) ৭ভাগে ফলমূল-ঐ
(৩) ৬ভাগে ফলমূল-ঐ
(৪) ১ভাগে ফলমূল-ঐ
(৫) একটি কুচা ফলের নৈবেদ্য
(৬) ডাব-১টি

যতগুলি নৈবেদ্য ও ফলের থালা হবে ততগুলি পাঁচ কড়াইয়ের খুরি ও পানের খিলি হবে।

সপ্তমীর পূজায়—

(ঘ) রাত্রিকালীন ভোগের

নৈবেদ্য—ন্যূনপক্ষে ৩ কেজি মিঠাই/খাবার (*ব্রাহ্মণ পাচক দ্বারা ঠাকুর বাড়ির ভিয়েনে প্রস্তুত করা ভাজা খাবার ও মিষ্টান্ন*)।

অষ্টমীর পূজায়—

প্রাতঃকালীন ২ দফায়, বৈকালিক জলযোগ ও রাত্রিকালীন ভোগরাগ সর্ব্বেব ৭মী পূজায় (ক), (খ), (গ) ও (ঘ)এ বর্ণিত ব্যবস্থা মত হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

কেবলমাত্র এই দিনে বিশেষ দুইটি (২) অধিকন্তু পূজা হইবে ঃ-

(১) ৫১ পীঠের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য — চাল ১ কেজি, মিষ্টি ৫১টি গুজিয়া

(২) নব ঘটের পূজা ৯টি নৈবেদ্য — চাল ২০০ গ্রাম, ৯টি গুজিয়া

মন্তব্য

৭মী/৮মী/৯মী তিন দিনেরই

বিঃ দ্রঃ মিঠাই প্রসাদ পুরোহিত মহাশয় পাবেন ১ কেজি, বাকি ২ কেজি সেবায়েতগণের মধ্যে বিতরণ করা হইবে। মোট ৯ কেজি

মহাষ্টমী বা সন্ধিপূজায় পরিবারের অগণিত সেবায়েত ছাড়াও বহু বহিরাগত ভক্ত ও দেবী দুর্গার উদ্দেশ্যে শাড়ী সমেত নৈবেদ্যাদি ইষ্টকামনা লাভার্থায় উৎসর্গ করেন। পুরোহিত, তন্ত্রধারক ও পূজারী ইত্যাদি সকলের মধ্যে কিছু কিছু বণ্টন করিয়া দিবার পর উদ্বৃত্ত শাড়ী বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ (শ্যামপুকুর) অনাথ আশ্রমকে দান করিয়া যথোপযুক্ত রসিদ সংগ্রহ করিতে হইবে দুর্গাপূজা কমিটির নামে।

সন্ধিপূজা

	চাল	চিনি	আগ সন্দেস	মিষ্টান্ন	পঁচ কড়াই	ডাব
(১) ১টি বৃহৎ থালায় নৈবেদ্য	৫ কেজি	—	১টি ২০০ গ্রাম	—	২টি খুরিতে ২৫০ গ্রাম ২টি পানের খিলি	
(২) ১টি বৃহৎ থালায় নৈবেদ্য	—	৫ কেজি	৩টি ২০০ গ্রাম	—	—	১টি
(৩) ১টি বড় মাঝারি থালায় নৈবেদ্য		—	—	দধি ২০০ গ্রাম রাবড়ি ৫০ গ্রাম রাজভোগ সন্দেশ চন্দ্রপুলি ইত্যাদি		

(৪) মাঝারি মেওয়ার থালা —

বেদানা	১টি
আঙ্গুর	২৫ গ্রাম
বাদাম	৫গ্রাম
পেস্তা	৫গ্রাম
খেঁজুর	১০টি
আমসত্ত্ব	২৫গ্রাম
মাখন	১ প্যাকেট
মিছরি	২৫ গ্রাম

(৫) মিঠাই ভোগ প্রসাদের সবটাই ব্রতীগণের প্রাপ্য

সন্ধিপূজা

করণীয় ঃ

(১) একটি থালায় ১টি লাল চেলি, শাঁখা ১ জোড়া, লাল কলি। ১গাছি লোহা, সিঁন্দুর ও সিন্দুরচুপড়ি এবং অর্ঘ্যটি প্রস্তুত রাখিতে হইবে

(২) ১০৮টি প্রদীপ প্রস্তুত থাকবে।

মন্তব্য -'

সন্ধি' পূজার চাল / চিনির নৈবেদ্য উৎসর্গীকৃত হ'লে ও পূজা সমাপনান্তে তাহা 'গুরুবংশে'র প্রাপ্য হয়।

যদিচ, গুরুবংশের কাহাকেও উক্ত ভোগ পাঠাইবার অসুবিধা থাকে বা হয়, তাহা হইলে বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ (শ্যামপুকুর) 'অনাথ আশ্রমকে' দান করিয়া দুর্গাপূজা কমিটির নামে উপযুক্ত রসিদ সংগ্রহ করিতে হইবে।

মোট মিঠাইয়ের প্রয়োজন:

সপ্তমী-	৩ কেজি
অষ্টমী-	৩ কেজি
সন্ধি-	৬ কেজি
নবমী-	৩ কেজি
গোপীনাথজীউ-	৩ কেজি
	মোট ১৮ কেজি

নবমী পূজায়

প্রাতঃকালীন ২ দফায়, বৈকালিক জলযোগ ও রাত্রিকালীন ভোগরাগ ও নৈবেদ্যাদি সর্ব্বেব/ ৭মী ও ৮মী পূজায় (ক), (খ), (গ), ও (ঘ) এ লিখিত ব্যবস্থার অনুরূপ হইবে।

এই দিন বলিদানের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন:

(১) একটি ছাগ শিশু,
(২) ২টি মাগুর মাছ,
(৩) ২টি ছাঁচি কুষ্মাণ্ড (কুমড়ো)
(৪) ৪খণ্ড ইক্ষু (এক গাছা বড় আখ থেকে কেটে)
(৫) ১টি বাতাবি লেবু (খড্গ প্রক্ষালনের জন্য)

এই দিনে করণীয় নবমীর সিধা

দেয় সিধার বস্তুসামগ্রী তিন জন (৩) ব্রতীকে সমভাবে ছাড়াও উহার কিয়দাংশ সেবায়েতগনের মধ্যে বিলি /বন্টনের ব্যাপারে আলাদা ফর্দ্দ / হিসাব দ্রষ্টব্য।

মন্তব্য

বলিদান- বলিদানের জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম নিষ্ঠাগুলি পালন করা উচিত। ১। বলিদানের জায়গায় একটি চাদরের চারদিকের প্রান্তগুলি ৪জন কর্ম্মচারী (অভাবে সেবায়েত) ধরিয়া একটি চাঁদোয়ার মত ব্যবস্থা করিতে হইবে কারণ উন্মুক্ত আকাশের নীচে ঐ মাঙ্গলিক ক্রিয়া বিধেয় নহে।

২। পূর্বাহ্নেই যূপকাষ্ঠ (হাঁড়িকাঠ) প্রোথিত করা থাকিবে এবং যথা সময়ে একটি মাটির সরায় আস্ত কলা ছাড়ানো ও সামান্য মিষ্টান্ন রাখিতে হইবে যূপকাষ্ঠের সম্মুখে-ইহাকে বলিদানের খপ্পর বলা হয়।

৩। পূর্বাহ্নেই ছাগমুন্ডটি রাখিবার জন্য দেবী দুর্গার সম্মুখে পরিমার্জ্জিত একটি কদলী পত্র (কলাপতা)বিছাইয়া রাখিতে হইবে।

৪। বলিদানের জায়গা হইতে দেব দেউলে আসার পথে ছাগমুন্ড নিঃসৃত সকল রুধির বিন্দু অবিলম্বে পরিমার্জ্জনের উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

৫। দেবীকে নিবেদনের জন্য যাহাতে অবাধে এবং বিন্দুমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া ছাগমুন্ডটি দেউলে পৌঁছাইতে পারে এ জন্য সমস্ত পথটি মুক্ত রাখা প্রয়োজন। ঐ পথে ঐ সময়ে কোন কারণেই ভক্ত সাধারণের প্রবেশ বা জটলা করা বাঞ্ছনীয় হইবে না।

নবমীর সিধার মোট বাজারের ফর্দ্দ

মুদির দোকান থেকে

চাল—	৫ কেজি
সরিষার তৈল—	১৫০ গ্রাম
মুগের ডাল—	২০০ গ্রাম
মটর ডাল —	২০০ গ্রাম

কাঁচা বাজার

আলু —	৩টি
পটল —	৬টি
বেগুন —	৩টি
ঢেঁড়স —	৬টি
ঝিঙে —	৩টি
ফুলকপি —	৩টি
কুমড়ো —	৩টি
মুলা —	৩টি
থোড় —	৩টি
রাঙাআলু —	৩টি
মানকচু —	৩টি
করলা —	৩টি
মাখন সিম —	৩টি
নোটে শাক —	৩ আঁটি
কাঁচা তেঁতুল —	৩টি

রুইমাছ ৩টি

প্রতিটি অন্ততঃ ২৫০ থেকে ৩০০ গ্রামের মধ্যে হলে ভাল হয়।

চিরাচরিত ব্যবস্থা বা প্রথা মত নবমীর সিধা তিনজন ব্রতীর প্রাপ্য, এই সিধার চাল ও আনাজপত্রে সেবায়েতগণেরও ভাগ থাকে।

কথিত আছে নবমীর সিধার চাল ও আনাজে প্রস্তুত অন্নভোগে ভক্ত সেবায়েতগণের ধন লাভ বা ধন বৃদ্ধি হয়।

দশমীর পূজা

দশমীর বিহিত পূজা নৈবেদ্য	চাল	২ কেজি
	আগসন্দেশ	২টি
	গুজিয়া	৩০টি
	দধি	২০০গ্রাম

এই দিনে আবও ২টি বিশেষ পূজা হয়.

১। অগ্র পূজা ১০টি নৈবেদ্য হয

২। অশ্ব পূজা কিছুকাল পূর্ব্বেও একটি অশ্ব আনয়ন করিয়া যথাবিহিত পূজা করা হইত। এক্ষনে উদ্দেশে পূজা হয় - নৈবেদ্য ও ২৫ গ্রাম ছোলা ভিজানো থাকে।

কনকাঞ্জলি- দশমীব বিহিত পূজা সমাপনান্তে সেবায়েতগনের মধ্যে চারিজন প্রতিমার পিছনে একটি চাদবের চারিটি প্রান্তমুখ ধরিয়া অপেক্ষামান অবস্থায় পুরোহিত মহাশয় প্রতিমার সম্মুখে একটি ঘড়াঞ্চির সাহায্যে কিছুটা উপরে উঠিয়া দেবীর মাথার উপর দিয়া পশ্চাদ্দিকে কনকাঞ্জলি নিক্ষেপ করেন - এই কনকাঞ্জলি উক্ত প্রলম্বিত চাদরের আধারের মধ্যে পড়ে। এই কনকাঞ্জলিতে প্রদত্ত হয় একটি রেকাবে ৫০ গ্রাম আন্দাজ তন্ডুল, ১টি সিন্দুর কৌটা ও ১টি স্বর্নমুদ্রা (মোহোর)।

চিবাচরিত প্রথানুযায়ী পরিবারের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা সধবা বধূমাতার হেফাজতেই দুর্গাপূজায় প্রদও চারিটি অর্ঘ্য ও কনকাঞ্জলি থাকিবে। পরিবারের কন্যাগনের বিবাহের পরবর্ত্তী দিবসে অর্থাৎ বাসী বিবাহের দিন ঐ অর্ঘ্য অন্যতম মাঙ্গলিকী হিসাবে প্রয়োজন হয়। স্বর্নমুদ্রাটি (মোহোরটি) পূর্বে পরিবারের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা সধবা বধূমাতারই প্রাপ্য হইত।

সম্পাদনা,

শ্রীসুনীলেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বি,কম, সি,এ, আই,আই,বি, ৪ সি রাজা কালী কৃষ্ণ লেন, কলি-৫

বুধবার ১২ই জুলাই ১৯৮৯

মোট ফর্দ্দ

	চাল	চিনি	পাঁচ কড়াই	গব্য ঘৃত	সং তৈল	মধু	ডাব	আগ সন্দশ
কাঠামো পূজা	১কেঃ	২০০গ্রাঃ	২৫গ্রাঃ	৫গ্রাঃ	-	৫গ্রাঃ	সশিব ১টি	গুজিয়া ২০০
বোধন পূজা (১৩দিন) দৈনিক	১৬.৯০০ গ্রাঃ (১.৩০০) গ্রাঃ	৩.৯০০ গ্রাঃ (৩০০) গ্রাঃ	১.৩০০ গ্রাঃ (১০০) গ্রাঃ	১০০ গ্রাঃ	৩০০ গ্রাঃ	২৫গ্রাঃ	পূজাদং ১৩টি দ্বার কলস ৪ টি	আঃ ৯টি গুজিয়া প্রতিদিন২৮টি প্রতি রাত্র আঃ ২ টাঃ গুজিয়া ৪ টি
অন্যান্য পূজা সিধা ইত্যাদিতে (আলাদা হিসাব)	১৬.৯৫০ গ্রাঃ	৩৫০ গ্রাঃ			২০০ গ্রাঃ		৩টি সরায় ৩টি নবপত্রিকা ১টি	সন্দেশ ১টি আঃ ২টি গুজিয়া ৬০টি
পূজা দং (৭মী/৮মী/৯মী/ সন্ধি/দশমী)	১২.৬০০ গ্রাঃ	৯.৭০০ গ্রাঃ	৭৫০ গ্রাঃ	১০০ গ্রাঃ	১.১০০ গ্রাঃ	৫০ গ্রাঃ	৭মী ৩টি ৮মী ৩টি ৯মী ৩টি সন্ধি ১টি দশমী ১টি দ্বার কলস ৪টি	আঃ সঃ ১৬ গুজিয়া ১৫০ সন্দেশ ৩ এ ছাড়া সন্ধি পূজায় নানা রকম সন্দেশ ইত্যাদি
	৪৭.৪৫০ গ্রাঃ	১৪.১৫০ গ্রাঃ	২.০৭৫ গ্রাঃ	২০৫ গ্রাঃ	১.৬০০ গ্রাঃ	৮০ গ্রাঃ		

স্বাঃ কমলা দেব
১৯০৮-১৯৯৯

এই গ্রন্থটি লেখার সময় যে সমস্ত বই এবং পত্রপত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে তারই তালিকা

১। Life of Maharaja Nava Krishna Deva Bahadur of Sobhabazar, Calcutta; Beepin Beharry Mittra, Calcutta. 1879. p. 93.

২। Memoirs of Maharaja Nubkissen Bahadur: N. N. Ghose. Calcutta. 1901. p. 241.

৩। কলিকাতা সেকালের ও একালের; হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। ১৯৮৫। ৬৮০ পৃ:

৪। বাংলার খেতাবী রাজ-রাজড়: বিমল চন্দ্র দত্ত। ১৯৯২। শোভাবাজারের দেব রাজপরিবার (২২- ৩৬ পৃ:)

৫। সাবেক কলকাতার রাস্তার ইতিহাস: সমীর রায়চৌধুরী। ১৯৯৭। ২৯৪ পৃ:

৬। কলিকাতার ইতিহাস: রাজা বিনয় কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের - The Early History and Growth of Calcutta অবলম্বনে সুবল চন্দ্র মিত্র। ১৯৮৯। ২৩৬ পৃ:

৭। কলিকাতা দর্পণ: রাধারমন মিত্র, প্রথম পর্ব। ১৯৮৮।

৮। ধন্য বাগবাজার: সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। ১৯৯৮, ৭৯৬ পৃ: রবীন্দ্রনাথ বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট।

৯। কলিকাতার রাজপথ- সমাজে ও সংস্কৃতিতে: অজিত কুমার বসু। ১৯৮৬। ৪৯৫ পৃ:

১০। দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী স্মবণিকা: রাজা রাধাকান্ত দেব। ১৯৮৫। ১১৮ পৃ: রাজা রাধাকান্ত দেব দ্বিশততম জন্মবার্ষিক সমিতি, শোভাবাজার রাজবাটি।

ক: ঐ হিন্দু কলেজ ও রাধাকান্ত দেব: সুভাষ বন্দোপাধ্যায়

খ: ঐ রাধাকান্ত দেব: একটি বৈপরীত্যের সন্ধানে অসিত কুমার বন্দ্যাপাধ্যায়।

গ: ঐ রাধাকান্ত দেব: কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি-জগন্নাথ চক্রবর্তী।

১১। কলেজ ষ্ট্রীট, ১৪০৪ (শারদ সংখ্যা): আট রাজবংশের ইতিহাস - নবকৃষ্ণ: হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, ১৩৪ - ১৩৮ পৃ: মহারাজা নবকৃষ্ণ- সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে: বিপিন বিহারী মিত্র, ১৪৭ - ১৪৯ পৃ: রাজা স্যার রাধাকান্ত দেববাহাদুর: লোকনাথ ঘোষ, ১৫০- ১৫৯ পৃ:

মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর: সম্পাদক ভারতবর্ষ, ১৮০ পৃ:

১২। কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত (The native aristocracy and gentry): মূল

তিন শতাব্দীর শোভাবাজার রাজবাড়ি
লেখক- লোকনাথ ঘোষ, অনুবাদক- শুদ্ধোদন সেন। ১৯৮৩। ২৮১ পৃ:

১৩। সবুজ পাতার ডাক: হারীত কৃষ্ণ দেব। ১৯৯৭। ২২৫ পৃ:

১৪। অঞ্জন দেবর কবিতা: অঞ্জন দেব। ১৩৭৯। ৭২ পৃ:

১৫। ৩০০ বছরের কলকাতা: পটভূমি ও ইতিকথা- অতুল সুর। ১৯৮৮। ২২৬ পৃ:

১৬। দেশ-বিনোদন, ১৩৯৬ : সেকালের থিয়েটার-জগন্নাথ ঘোষ। ১৩৯ পৃ:

১৭। A Short History of Calcutta : Part I, A. K. Ray. 1982. p.320

১৮। কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত : বিনয় ঘোষ। প্রথম খণ্ড, ১৯৮১। ৪৪০ পৃ:
দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯৭। ২৮৭ পৃ:

১৯। কলিকাতার ইতিবৃত্ত : প্রাণকৃষ্ণ দত্ত। ১৯৮১। ২২৩ পৃ:

২০। Calcutta : Old and New. H. E. A. Cotton. 1980. p.854

২১। কলকাতার রাজকাহিনী : পূর্ণেন্দু পত্রী। ১৯৭৯।

২২। The Golden Book of India : Roper Lethbridge, London. 1893. p. 584

২৩। The Cyclopedia of India, Vol II, 1906.

২৪। রাধাকান্ত দেবের গৃহের সামাজিক রীতি ও পূজাপদ্ধতি : অপর্ণা দেব। রাজা রাধাকান্ত দেব দ্বিশততম জন্মবার্ষিক স্মারক পত্রিকা, ১৯৮৪।